POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ○ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ○ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবুরে উপদেশবাণীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে। এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

(আল আম্বিয়া: ১০৬,১০৭,১০৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 16-17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16-23 Apr 2026 | 27 শওয়াল- 05 জুল কাআদা 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আরবজাতির বিনাশ ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ধ্বংস ও বিপর্যয় আরবদের জন্য, সেই অশুভ ও অনিষ্টের কারণে যা নিকটে এসে গেছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর থেকে এতটুকু ফাঁক খুলে গেছে।" এ কথা বোঝানোর জন্য তিনি তাঁর দুই আঙুল-বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের আঙুল-দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব, যদিও আমাদের মধ্যে নেক লোকও রয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, যখন পাপাচার ও অনাচার বৃদ্ধি পায় এবং তা নেকীর উপর প্রাধান্য লাভ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ফিতন, অধ্যায়-কউলুন্নবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৪৬)

পবিত্রভূমি 'সৎকর্মশীল'দের উত্তরাধিকার

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ***'আল আরজ'*** দ্বারা শাম (সিরিয়া)-এর ভূমিকে বোঝানো হয়েছে, এবং এটি সৎকর্মশীলদের উত্তরাধিকার; এবং এখন পর্যন্ত এটি মুসলমানদের অধীনেই রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ***'ইউরিসুহা'*** ("তারা এর উত্তরাধিকারী হবে) শব্দ ব্যবহার করেছেন, ***'ইয়ামলিকুহা'*** ("তারা এর মালিক হবে) বলেননি। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে এই ভূমির প্রকৃত উত্তরাধিকারী মুসলমানরাই থাকবে; এবং যদি কোনো সময় এটি অন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তবে সেই নিয়ন্ত্রণ হবে সাময়িক-যেমন একজন ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে অস্থায়ীভাবে অন্যের দখলে দেয়।

এটি আল্লাহ তাআলার ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা প্রদর্শন করে। যেহেতু শামের ভূমি নবীদের ভূমি, তাই আল্লাহ তাআলা চান না যে এটি স্থায়ীভাবে অন্যদের উত্তরাধিকার হয়ে এর অসমম্মান হোক।

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ("আমার সৎকর্মশীল বান্দারা এর উত্তরাধিকারী হবে) এই বাক্যে সালেহীন শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, অন্ততপক্ষে পুণ্যের উপর যেন তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, তাতে তিনটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে: 'জালেম', 'মুকতাসিদ', এবং 'সাবিক বিল খয়রাত'। এগুলো ঈমানের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে, এবং এরা সকলেই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

'জালেম' সে ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনও অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে। 'মুকতাসিদ সে, যে নিজের প্রবৃত্তি (আত্মসত্তা) ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; কখনো সে বিজয়ী হয়, আবার কখনো পরাজিত হয়-অর্থাৎ তার মধ্যে ত্রুটি এবং পুণ্য উভয়ই বিদ্যমান। আর 'সাবিক বিল খয়র' সে ব্যক্তি, যে এই দুই স্তর অতিক্রম করে সর্বদা সৎকর্মে অগ্রগামী থাকে এবং পুণ্যের প্রতি পরিপূর্ণরূপে সমর্পিত থাকে; সে নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেছে।

পবিত্র কুরআন এই সকল শ্রেণির মানুষকেই মুসলমান হিসেবে অভিহিত করেছে।

(আল-হাকাম, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৪০, ১০ নভেম্বর ১৯০২)

'ইবাদুস সালেহীন'পবিত্রভূমি উত্তরাধিকারী হবে

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বনী ইসরাঈলের ১০৫ নং আয়াত

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

[অনুবাদ: এবং তাহার পর আমরা বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব] -এর ব্যাখ্যায় বলেন: ***'উসকুনু ফিল আরজ'*** বলতে এখানে মিসরের ভূমিকে বোঝানো হয়নি, কারণ বনী ইসরাঈল শেষ পর্যন্ত মিসরে বসতি স্থাপন করেনি। বরং এখানে কেনানের ভূমিকে বোঝানো হয়েছে-অর্থাৎ সেই ভূমি, যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতএব, 'আল আরজ' শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট বা প্রতিশ্রুত ভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন: মূসাকে যে ভূমি দেওয়া হয়েছিল তা মিসর ছিল না, বরং মিসরের বিকল্প হিসেবে একটি অঞ্চল ছিল; পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঠিক সেই ভূখণ্ডই প্রদান করা হয়েছিল যা তাঁর স্বদেশ ছিল, এবং এর পাশাপাশি তাঁর শত্রুদের ভূখণ্ডও তাঁর অধীনে এসে যায়।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ("যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় উপস্থিত হবে) বাক্যাংশটি নির্দেশ করে যে বনী ইসরাঈলকে কেনানে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হবে। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় সেই ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু তারা আবারও অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে এবং দ্বিতীয়বার শাস্তি অবতীর্ণ হবে। এর পর তারা নির্বাসিত অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ না তাদের অনুরূপ আরেকটি জাতির উপর নির্ধারিত ধ্বংসের সময় উপস্থিত হয়। সেই সময়ে তাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে একত্রিত করে পুনরায় পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনা হবে।

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেমন এই সূরার সূচনায় বনী ইসরাঈলের জন্য দুইটি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তেমনি মুসলমানদের সম্পর্কেও অনুরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কারণ মুসলমানদেরকে বনী ইসরাঈলের প্রতিরূপ (মসীল) বলা হয়েছে, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিরূপ বলা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো সূরার শুরুতে দুইটি প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আছে, এবং উভয়ই শাস্তির প্রতিশ্রুতি: একটি পূর্ণ হয়েছিল বাবিলের রাজা বুখতনসর-এর মাধ্যমে, এবং অন্যটি রোমান শাসক টাইটাস-এর মাধ্যমে (প্রথম রুকু দেখুন)। এই দুই ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের সমবেত হওয়ার কথা নয়, বরং তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথাই উল্লেখ রয়েছে।

অপরদিকে, বর্তমান আয়াতে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় তাদেরকে পুনরায় পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে এই "দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি" ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এর সঙ্গে একটি "প্রথম প্রতিশ্রুতি-র অস্তিত্বও নিহিত রয়েছে। গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কুরআন কেবল সেই প্রেক্ষাপটেই এই দ্বৈততার উল্লেখ করে যেখানে মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু

(এরপর শেষের পাতায়....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ঐশী ইলহামের আলোকে 'হাকাম' ও 'আদাল' এর সিদ্ধান্তসমূহ

মহান প্রেরিত, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি উম্মতের মধ্যে 'আদল' (ন্যায়-বিচারক) ও 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) হিসেবে আবির্ভূত হবেন। হাদীসের বাণী নিম্নরূপ:

يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ

(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১১, মিশর সংস্করণ, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে; তিনি ইমাম মাহদী ও ন্যায়বিচারক হবেন। তিনি উম্মতের বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন।

উপরোক্ত হাদীসে যে বলা হয়েছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ 'আদাল' (ন্যায় বিচারক) হবেন, তার স্পষ্ট অর্থ এই যে, তাঁর যুগে মুসলমানরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হবে। তারা ইসলামী আকীদা ও বিধান বুঝতে গিয়ে এমন ভুল ধারণায় পতিত হবে যে, আলেমরাও এসব মতানৈক্য দূর করার ক্ষমতা রাখবে না। তখন ইমাম মাহদী-যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি-ঐশী ওহীর আলোকে এসব মতবিরোধ দূর করবেন।

যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানীকে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে 'আদাল' ও 'হাকাম'-এর মর্যাদা প্রদান করেন, তখন মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বরং আলেমরাও তীব্র বিরোধে লিপ্ত ছিলেন। তারা নিজেদের মনগড়া আকীদা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না; বরং পরস্পরকে বোঝানোর পরিবর্তে যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করত, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তলোয়ারের জিহাদে লিপ্ত ছিল-এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও আছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তারা একে অপরকে কাফির বা মুরতাদ ঘোষণা করত এবং রক্তপাত ঘটাত। যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি, তাদের অবস্থাও এখনো মূলত এমনই রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর আদেশ ও ঐশী ওহীর আলোকে যে সংস্কারসমূহ করেছেন, সেগুলোর উল্লেখ করার পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস তুলে ধরা প্রয়োজন, যেগুলোর সংশোধন তিনি করেছেন:

(১) খ্রিষ্টান মতবাদের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে-কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থীভাবে-এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঈসা (আলাইহিস সালাম) সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং তিনি সেই সশরীরে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন মুসলমানদের সংস্কার করার জন্য। আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-কে কুরআন মজীদ থেকে ত্রিশটি প্রমাণ শিক্ষা দেন, যার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ক্রুশে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তারপর বনী ইসরাঈলের হারানো গোত্রদের সন্ধানে হিজরত করেন এবং ১২০ বছর বয়সে কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন; শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে। আজ শুধু মুসলমানই নয়, বরং অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিত ও গবেষকরাও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুর প্রমাণ উপস্থাপন করছেন এবং কাশ্মীরে হিজরতের পক্ষে গবেষণাও প্রকাশ করেছেন।

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে তিনি খ্রিষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করেন যে ঈসা আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র, এবং মুসলমানদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকেও বাতিল করেন যে তিনি শারীরিকভাবে আকাশে আরোহণ করেছেন এবং একই দেহ নিয়ে পুনরায় অবতরণ করবেন। এই মহান সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মুসলিম ও খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ আহমদিয়ত-অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম-গ্রহণ করেছেন; আর যারা এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে তারা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের ধারণাকেই অস্বীকার করে একে কল্পকাহিনী বলে অভিহিত করছে, এবং এর ফলে শুধু কুরআন ও হাদীসই নয়, বরং উম্মতের হাজারো সাধক-সন্তকেও অস্বীকার করছে, যারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ প্রদান করেছিলেন।

(২) মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি ভুল ধারণা ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন শেষ নবী, যার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসতে পারে না-যদিও সে তাঁর উম্মতভুক্ত হয়।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) কুরআনের প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে নবুওয়ত একটি মর্যাদা, যা আল্লাহ তাআলা এখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। তিনি বলেন, যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহর একজন বিনীত অনুসারী, তাই এই অনুসরণের বরকতেই আল্লাহ তাঁকে নবুওয়ত ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের অনুগ্রহ দান করেছেন।

তিনি মুসলমানদের এই বৈপরীত্যও তুলে ধরেন যে, তারা একদিকে বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহর পর কোনো নবী আসতে পারে না, অথচ অন্যদিকে তারা বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর পর উম্মতে নবী হিসেবে আগমনের বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহর পূর্ণ অনুসরণ ও দাসত্বের মাধ্যমে উম্মতের মধ্য থেকে নবীর আগমনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি অবমাননার শামিল। তিনি বলেন:

"যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, তবে যদি আমার আমল পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তবুও আমি কখনো আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার এই মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কারণ এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া সব নবুওয়ত বন্ধ; শরিয়তপ্রদানকারী কোনো নবী আসতে পারে না, তবে শরিয়তবিহীন নবী আসতে পারে-কিন্তু অবশ্যই আগে তাকে উম্মতী হতে হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাজায়েন, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২)

আল্লাহর অনুগ্রহে গত একশত বছরেরও অধিক সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ভুল সংশোধন করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। এমনকি বড় বড় আরব আলেমরাও তাদের ভুল উপলব্ধি করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর এই সত্যনিষ্ঠ বান্দার প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী আরেকটি বিপজ্জনক ভুল ধারণা ছিল যে সশস্ত্র জিহাদ এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং আগমনকারী ইমাম মাহদী তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করবেন। প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে তাঁর যুগে সশস্ত্র জিহাদ রহিত হবে। সহীহ বুখারীতে আছে: 'ইউজাউল হারব'-অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন (কিতাবুল আম্বিয়া, নুযূল ঈসা ইবনে মরিয়ম অধ্যায়)। অন্য এক হাদীসে আছে: তিনি জিজিয়া রহিত করবেন (সহীহ মুসলিম)।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) ঘোষণা করেন যে আল্লাহ তাঁকে এই যুগে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর যুগে সশস্ত্র জিহাদ স্থগিত। তিনি বলেন:

"হে ইসলামের আলেম ও মোল্লারা! আমার কথা শোনো। আমি সত্য করে বলছি, এখন জিহাদের সময় নয়। আল্লাহর পবিত্র নবীর অবাধ্য হয়ো না। যে মসীহ আসার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন এবং সে নির্দেশ দিয়েছেন যে এখন থেকে তলোয়ার ও রক্তক্ষয়ী ধর্মীয় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। এখনও যদি তোমরা রক্তপাত থেকে বিরত না হও এবং এ ধরনের প্রচার বন্ধ না করো, তবে এটি ইসলামের পথ নয়। যে আমাকে গ্রহণ করবে, সে শুধু এ ধরনের প্রচার থেকে বিরতই থাকবে না, বরং একে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও আল্লাহর ক্রোধ-এর কারণ মনে করবে।"(গভর্নমেন্ট ইংরেজী অর জিহাদ)

তিনি আরও বলেন:

"এখন যখন প্রতিশ্রুত মসীহ এসে গেছেন, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো তলোয়ারের জিহাদ থেকে বিরত থাকা। আমি না এলে হয়তো এই ভুল ধারণার কিছুটা অজুহাত থাকত; কিন্তু এখন আমি এসে গেছি এবং তোমরা প্রতিশ্রুত দিনের সাক্ষী হয়েছ। অতএব এখন ধর্মের নামে তলোয়ার ধারণকারীদের আল্লাহর কাছে কোনো অজুহাত নেই। যে ব্যক্তি চোখ রাখে এবং হাদীস ও কুরআন অধ্যয়ন করে, সে সহজেই বুঝতে পারে যে এই যুগে যে জিহাদের পদ্ধতি অনেকেই অনুসরণ করছে তা ইসলামী জিহাদ নয়; বরং এটি প্রবৃত্তির তাড়না বা জান্নাতের ভ্রান্ত আশার ফল-যা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।"

তিনি আরও ঘোষণা করেন:

"দেখো, আমি তোমাদের কাছে একটি নির্দেশ নিয়ে এসেছি-এটি হলো, এখন থেকে তলোয়ারের জিহাদের অবসান, কিন্তু আত্মশুদ্ধির জিহাদ অব্যাহত থাকবে। এবং এটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং এটি আল্লাহরই ইচ্ছা।"

(গভর্নমেন্ট ইংরেজী অর জিহাদ)

নিজের কবিতায় তিনি বলেন:

"এখন ছেড়ে দাও, হে বন্ধুগণ, জিহাদের ধারণা;
ধর্মের জন্য যুদ্ধ ও রক্তপাত এখন নিষিদ্ধ।
দুই জগতের নেতা মুস্তফা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন
যে মসীহ এসে যুদ্ধ বন্ধ করবেন।
এই নির্দেশ শোনার পরও যে যুদ্ধ করতে যাবে,
সে কাফিরদের হাতে কঠোর পরাজয়ের সম্মুখীন হবে।"

(তুহফা গোলড়ভিয়া, পৃষ্ঠা ৪০)

এখন আমরা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি-তারা নিজেরাই বিচার করুন: ১৯০০ সালের পর থেকে, যখন সত্য ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম) তলোয়ারের জিহাদের অবসানের ঘোষণা দেন, তখন থেকে কি কোনো যুদ্ধ, যা জিহাদের নামে সংঘটিত হয়েছে, মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয় এনে দিয়েছে? নাকি এই যুদ্ধগুলো মুসলমানদের দ্বারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে পারস্পরিক হানাহানি হয়েছে, ইসলামের বদনাম হয়েছে এবং মুসলমানরা দুর্বল হয়েছে? চিন্তা করো, গভীরভাবে ভাবো!

হায়! যদি মুসলমানরা আল্লাহ প্রেরিত এই সত্য প্রতিশ্রুত মসীহের হৃদয়স্পর্শী আহ্বান গ্রহণ করত, তবে আজ মুসলমান মুসলমানের রক্তপাত করত না, এবং তাদের শক্তি ইতিবাচক কাজে ব্যবহৃত হতো।

অতএব, এসো 'হাকাম' ও 'আদাল'-এর ফয়সালার দিকে। 'হাকাম' ও 'আদাল'-এর আরও কিছু ফয়সালা সম্পর্কে পরবর্তী প্রকাশনায় আলোচনা করা হবে। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (সফলতা আল্লাহর কাছ থেকেই)।

জুমআর খুতবা

হে আমার চাচা! আমি এ কথা বলছি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে থাকুন। আপনি নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন এবং আপনার জাতির পক্ষ অবলম্বন করুন। কিন্তু আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার কসম খেয়ে বলছি! তারা যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চাঁদকে আমার বামে এনেও দাঁড় করিয়ে দেয়, তবুও আমি খোদা তা'লার তওহীদের প্রচার থেকে বিরত হতে পারব না। আমি আমার কাজে রত থাকব, যতক্ষণ না খোদা আমাকে মৃত্যু দান করেন। [মহানবী (সা.)]

সমস্ত নবী-রাসূল পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আগমন করেছিলেন এবং তারা তাদের নিজ নিজ কওমকে এর শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ এই তাওহীদকে পরিত্যাগ করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ?-ও একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন-এই কাজকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তাওহীদের প্রকৃত চেতনা জাগ্রত করার জন্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর যে মর্যাদা, তা অন্য কারও নেই।

তিনি যদি তাওহীদ গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে তার পক্ষে যুক্তিও প্রদান করেছেন। তিনি যদি শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকেন, তবে তা অন্ধভাবে নয়; বরং শিরকের অকল্যাণ ব্যাখ্যা করে, তা বুঝিয়ে মানুষের মধ্যে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুসারীরাও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে তাওহীদের শিক্ষা এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের রক্তে-মজ্জায় মিশে গেছে।

তাঁর এই শিক্ষা তাঁর অনুসারীদের উপর এত গভীর প্রভাব ফেলেছিল, কারণ তাঁর নিজের প্রতিটি কথা ও কাজ সেই শিক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মহান শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তার জীবন্ত নমুনা।

ইবাদতের যে পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি তাওহীদের মর্যাদা রক্ষা করে ইবাদত করেছেন, অন্য কোনো ধর্মে তার সামান্য অংশও দেখা যায় না।

সূরা ইখলাস এমন একটি ঘোষণা, যা সকল ধর্মের বিকৃত শিক্ষার প্রতিবাদ করে। এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। আর এর সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ নমুনা আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ?। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য অতিবাহিত হয়েছে।

নবী করীম -এর স্বভাব এতটাই পবিত্র ছিল যে তাওহীদের প্রতি ভালোবাসা তাঁর রক্তে-মজ্জায় প্রোথিত ছিল। নবুয়ত লাভের আগেই তাঁর স্বভাব শিরক ও মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ ছিল।

এটিওতাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে আগমন করেছিলেন যখন পৃথিবী গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই একজন মহান সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল। আর তিনি এমন সময়ে ইন্তেকাল করেন, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওহীদ ও সৎপথ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণ সংস্কার তাঁরই বিশেষ কৃতিত্ব-তিনি এক বর্বর ও পশুসুলভ স্বভাবের জাতিকে মানবিক গুণাবলিতে গড়ে তুলেছিলেন।

"আজ পৃথিবীর পৃষ্ঠে 'তাওহীদ' নামে যে জিনিসটি আছে, তা নবী করীম ?-এর উম্মত ছাড়া অন্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না। আর কুরআন শরীফ ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থের চিহ্নও পাওয়া যায় না, যা কোটি কোটি মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম সম্মানের সঙ্গে সত্যিকারের আল্লাহর দিকে পথনির্দেশ করে।" (হযরত মসীহ মাওউদ আ.)

নবী করীম (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের কর্তব্য হলো তাওহীদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা এবং এ জন্য নিজেদের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করা। এটি ইবাদতের বিশেষ মাস-রমজান। এ মাসে বিশেষভাবে এ প্রচেষ্টা করা এবং এর জন্য দোয়া করা উচিত।

নবী করীম ? তাঁর সমগ্র জীবন তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন, যদি আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করি, তবে আমাদেরও এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সব ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং একই চেতনা তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছিলেন। তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন-"আহাদ, আহাদ"(এক, এক) ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে নির্যাতন সহ্য করেছেন।

আমাদের কাজ হলো তাওহীদের ঘোষণা অব্যাহত রাখা এবং যেখানে এই বার্তা পৌঁছাই, সেখানে আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থারও স্পষ্ট উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা।

তবেই আমরা প্রকৃত একেশ্বরবাদী এবং আল্লাহর আদেশ পালনকারী হিসেবে গণ্য হতে পারব।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা.)-এর সীরাতের এক হৃদয়গ্রাহী ও ঈমান-উদ্দীপক আলোচনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৭ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,পৃথিবীর সকল নবী তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে এর শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই তওহীদকেজলাঞ্জলি দিয়েছে। মহানবী (সা.) একই বার্তা নিয়ে এসেছেন, একই কাজ অব্যাহত রাখার জন্য এসেছেন এবং নিজ অনুসারীদের মাঝে এই তওহীদের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর (সা.) যে মর্যাদা রয়েছে, তা অন্য কারো নেই।

তিনি (সা.) যদি তওহীদ মেনে নেওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে তওহীদগ্রহণের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) শিরকের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করেছেন, তা নিছক

অযৌক্তিকভাবে করেন নি; বরং শিরকের মন্দ দিকগুলো বুঝিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর (সা.) অনুসারীরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, তওহীদের শিক্ষা এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গেছে।

এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন তা এতই পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী ছিল যে, এর কোনো সুযোগই ছিল না- কেউ এর গভীরতা অনুধাবন করার পরও তা থেকে দূরে সরে যাবে।

তাঁর (সা.) এই শিক্ষা, যা তাঁর অনুসারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটির প্রভাব বিস্তারী হবারকারণ হলো- তাঁর নিজের প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি; এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) যে মহান শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন তার বাস্তব নমুনা।

তাঁর যদি কোনো চিন্তা থেকে থাকে তবে তা এটাই ছিল যে, অন্য জাতিরা যেভাবে নিজেদের নবীদেরকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছে, মুসলিম উম্মাহর মাঝেও যেন এই ভয়ানক পাপের জন্ম না হয়। তাঁকে কখনো খোদা তা'লার সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে-এ আশঙ্কায় তিনি খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর এ বিষয়ে তিনি উম্মতকেও নসীহত করেছেন যে, আমাকে কখনো শিরকের কারণ বানিও না। তোমাদের দৃষ্টি যেন খোদা তা'লা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ না হয়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৪, হাদীস-৭৩৫২)

সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি খোদাপ্রেম বা ইবাদতের যে উল্লেখ করেছি, তাতে বর্ণিত বিষয়গুলো বা এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যে ঘটনাই তুলে ধরেছি, তা তওহীদের দিকেই পথনির্দে শ করে। অথবা এতে তওহীদ প্র তিষ্ঠার জন্য তাঁর (সা.) একটি প্রবল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, একটি ব্যাকুলতা দেখা যায়। আর এটি একদিকে যেমন তওহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতিফলন ঘটায়, যা শৈশব থেকেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে তাঁর প্র তি অবতীর্ণ শিক্ষা- যা আল্লাহ্ তা'লার সর্বশেষ শিক্ষা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা- তা থেকেও আমরা এর গভীরতা সম্পর্কে জানতে পারি।

পবিত্র কুরআনে বার বার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে তওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা আল-আম্বিয়াতে বলেন: وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬)

অর্থাৎ, "আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি আমরা (এই বলে) ওহী করতাম, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। অতএব, আমারই ইবাদত করো।"

আর এরপর ইবাদতের যে পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়েছে এবং তওহীদের মর্যাদাপ্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি (সা.) যেভাবে ইবাদত করেছেন, অন্য কোনো ধর্মে এর শতভাগের একভাগও দেখা যায় না।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

قُلۡ اِنِّىۡۤ اُمِرۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّيۡنَ (সূরা আয-যুমার: ১২)

অর্থাৎ, "তুমি বলো, 'নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদত করি।"

সুতরাং, একজন প্রকৃত মুসলমানও যখন এটি পড়বে তখন সেও এই ঘোষণা করবে যে, আমাকে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে হবে, খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই আদর্শের ওপর চলতে হবে, যা মহানবী (সা.) এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি খাঁটি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আমাদের ইবাদতের মানও উন্নত করি, তবেই আমরা এক বিপ্লব আনয়নকারী হতে পারব, নচেৎ এগুলো শুধুই মুখের কথা। আর তখনই আমরা প্রকৃত মুওয়াহহিদ (তথা একত্ব বাদী) আখ্যায়িত হতে পারব। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا (সূরা আন-নিসা: ৩৭)

"আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং কোনো কিছুকেই তাঁর শরীক কোরো না।"

অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَاِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِيۡمُ (সূরা আল-বাকারা: ১৬৪)

অর্থাৎ, "আর তোমাদের উপাস্য হলেন এক-অদ্বিতীয় উপাস্য। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই- (যিনি) স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।"

এরপর পবিত্র কুরআনের শেষ দিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলেন: قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۔ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

অর্থাৎ, "তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বনির্ভরস্থল।তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য অন্য কেউ নেই।" (সূরা আল-ইখলাস: ২-৫)

আল্লাহ্ তা'লা এখানে সব ধরনের শিরক খণ্ডনের ঘোষণা দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, পৃথিবীতে এটি ঘোষণা করে দাও। সুতরাং, আমরা তাঁর (সা.) অনুসারীরাও যখন এটি পড়ব, তখন আমাদেরও দায়িত্ব হলো এই খাঁটি তওহীদের ঘোষণা করা, যার ঘোষণা এই সূরায় দেওয়া হয়েছে এবং আরো অনেক স্থানে দেওয়া হয়েছে। আর নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এটি জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্ তা'লাই একক এবং তিনি সব কিছুর অমুখাপেক্ষী; বরং প্রতিটি বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারোপিতা নন, পুত্রও নন এবং তাঁর মতো কেউই হতে পারে না।

এটি এমন এক ঘোষণা যা প্রতিটি ধর্মের বিকৃত শিক্ষাকে খণ্ডন করে এবং এটিই সেই শিক্ষা, যার ঘোষণার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আর এর সবচেয়ে উন্নত ও মহান আদর্শ হলেন আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর (সা.) জীবনের প্র তিটি মুহূর্ত তওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজে অতিবাহিত হয়েছে; বরং যেমনটি আমি বলেছি, শৈশব থেকেই খাঁটি তওহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর তরবিয়ত করেছিলেন। এগুলো পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত আমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র, এমন বাণীতে তো পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ।

আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতেরও কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকে নবু ওয়তের দাবি পর্যন্ত এবং জীবনভর তওহীদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ও প্রচেষ্টা দেখা যায়।

মহানবী (সা.)-এর স্বভাব এতটাই পবিত্র ছিল যে, তওহীদের প্রতি ভালোবাসা তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রোথিত ছিল এবং নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই তাঁর প্রকৃতি শিরক ও মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বর্ণনা করতেন, 'বুওয়ানা' এমন একটি প্র তিমা ছিল যাকে কুরাইশ খুব সম্মান করত। তারা এর কাছে উপস্থিত হয়ে কু রবানী করত এবং বছরে একদিন সেখানে ইতিকাফ করত। আবু তালিবও নিজের লোকদের নিয়ে সেখানে যেতেন এবং মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানাতেন। এমনকি একবার হুযূর (সা.)-এর ফুফুরা এবং আবু তালিব তাঁর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হন এবং বলতে থাকেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কী চাও? তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের উৎসবে অংশ নিয়ে তাদের সমাবেশকে সমৃদ্ধ করবে না? যাইহোক, একবার তাঁর ফুফুদের পীড়াপীড়িতে তিনি (সা.) সেখানে তো গেলেন, কিন্তু চরম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন, আমি সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। ফুফুরা বললেন, এত নেক মানুষের ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তারা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখেছ? তিনি (সা.) জানালেন, যখনই আমি মূর্তির কাছাকাছি যেতে উদ্যত হতাম, তখনই এক সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চিৎকার করে বলত, হে মুহাম্মদ! পেছনে থাকো এবং এই মূর্তিকে স্পর্শ কোরো না। এরপর মহানবী (সা.) আর কখনো মুশরিকদের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লা সবসময় তাঁকে এমন শিরকপূর্ণ প্রথা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। (দালাইনুন নবুয়্যত, লিল বাইহাকি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৮) এটি নবুওয়তের দাবির পূর্বের ঘটনা।

শৈশবে নিজ চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফরের সময় যখন বাহিরা নামক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন মহানবী (সা.) তার একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "আমাকে লাত ও উযযা মূর্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস কোরো না। খোদার কসম! আমার কাছে এগুলোর চেয়ে অধিক ঘৃণ্য বস্তু আর কোনো কিছু নেই। (দালাইনুন নবুয়্যত, লিল বাইহাকি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

মহানবী (সা.) যখন হযরত খাদীজার (রা.) বাণিজ্যপণ্য নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই পণ্য বিক্রি করেন এবং এর বদলে অন্য মালামাল ক্রয় করেন।সেই সময়ে একটি বিষয়ে তাঁর (সা.) এবং এক ব্যক্তির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই ব্যক্তি বলে, লাত ও উযযার কসম খাও, তবেই আমি তোমার কথা মানব; এই কসম খাও, সাক্ষ্য দাও। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি কখনোই এসব মূর্তির কসম খাই নি। আমি এগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও মুখ ফিরিয়ে নিই, আর তুমি আমাকে বলছ কসম খেতে? এটি কীভাবে হতে পারে? (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

এই তওহীদের ভালোবাসায় তিনি (সা.) হেরা গুহায় যেতেন। এর উল্লেখ আগেও করা হয়েছে। সেখানে এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত এবং তওহীদের

মহান আল্লাহর বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

জন্য তাঁর অন্তরে ব্যাকুলতা থাকত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এক স্থানে এর চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন: হেরা গুহা মক্কার পাহাড়গুলোর মাঝে হেরা নামক একটি সুপরিচিত পাহাড়ে অবস্থিত, যা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আজকাল একে জাবালে নূর বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর মূর্তি র প্রতি তো ঘৃণা ছিলই, তিনি (সা.) মূর্তিপূজারীদের এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদা থেকে দূরে সরে যাওয়া লোকদের জন্যও আক্ষেপ করতেন। শুধু নিজের জন্যই নয়, বরং মানুষের জন্যও তাঁর আক্ষেপ ছিল যে, তারা কেন মূর্তিপূজা করে। আর নবুওয়ত লাভের পূর্বে লোকালয় থেকে দূরে এই গুহায় তিনি ইবাদত করতেন। মহানবী (সা.) যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন একদিন জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হন এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর সর্ব প্র থম ওহী অবতীর্ণ হয়, যার মাধ্যমে খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই প্রথম ওহীর সাথে সাথেই মহানবী (সা.) মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের প্রতি ডাকতে শুরু করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি (সা.) তাঁর এই মিশনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি; বরং অত্যন্ত নীরবে কাজ শুরু করেন এবং কেবল নিজের পরিচিত গণ্ডির মাঝেই স্বীয় শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ১১৭-১২০) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের নবী (সা.) ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, যিনি হারিয়ে যাওয়া সত্যকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি সমগ্র বিশ্বকে এক অমানিশায় নিমজ্জিত পেয়েছিলেন এবং তারপর তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার আলোতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে জাতির মাঝে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই সমগ্র জাতি শিরকের পোশাক ছুঁড়ে ফেলে তওহীদের পোশাক পরিধান না করা পর্যন্ত তিনি ইন্তে কাল করেন নি। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং তারা ঈমানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাদের দ্বারা সততা, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের এমন সব কাজ সম্পাদিত হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এই সফলতা এবং এমন সফলতা মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর ভাগ্যে জোটে নি। এটিই মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের সত্যতার একবিশাল প্রমাণ যে, তিনি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন যুগ চরম অন্ধকারে নিপতিত ছিল এবং স্বভাবতই একজন মহান সংস্কারকের মুখাপেক্ষী ছিল। আর তারপর তিনি এমন এক সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তওহীদ এবং সরল পথ অবলম্বন করে নিয়েছিল।আর প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণাঙ্গ সংস্কার কেবল তাঁর সাথেই নির্দিষ্ট ছিল যে, তিনি এক বন্য প্রকৃতির ও পশুতু ল্য জাতিকে মানবীয় শিষ্টাচার শিখিয়েছিলেন। অথবা অন্য কথায় এভাবে বলা যায় যে, তিনি পশুদের মানুষ বানিয়েছিলেন, এরপর মানুষদেরকে শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছিলেন এবং শিক্ষিত মানুষদের খোদাভীরু মানুষে পরিণত করেছিলেন, তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার চেতনা ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তারা খোদার পথে ছাগলের মতো জবাই হয়েছে এবং পিপীলিকার মতো পদদলিত হয়েছে, কিন্তু ঈমানকে হাতছাড়া করে নি; বরং প্রতিটি বিপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।সুতরাং, নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নবী (সা.) ছিলেন দ্বিতীয় আদম; বরং প্রকৃত আদম তিনিই ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে ও যাঁর বদৌলতে সমস্ত মানবীয় গুণাবলি পূর্ণতায় পৌঁছেছিল এবং সমস্ত পুণ্যময় শক্তি আপন আপন কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, আর মানব প্রকৃতির কোনো শাখাই নিষ্ফলা থাকে নি। আর তাঁর ওপর নবুওয়তের পরিসমাপ্তি শুধু শেষে আসার কারণেই হয় নি, বরং এই কারণেও হয়েছে যে, নবুওয়তের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সত্তায় পরম মার্গে উপনীত হয়েছে।

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬-২০৭)

তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, হে খোদা! তোমার প্রতি হাজার হাজার শুকরিয়া যে, তুমি নিজেই আমাদেরকে তোমাকে চেনার পথ দেখিয়েছ এবং তোমার পবিত্র কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে চিন্তা ও বুদ্ধির ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেছ। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি, যাঁর মাধ্যমে খোদা এক পথভ্রষ্ট বিশ্বকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন; সেই অভিবাবক ও কল্যাণময় সত্তা- যিনি পথহারা সৃষ্টিকে পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন, সেই সৎকর্মশীল ও অনুগ্রহকারী- যিনি মানুষকে শিরক ও মূর্তিপূজার বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন, অথবা সেই জ্যোতি ও জ্যোতিবিচ্ছুরণকারী- যিনি বিশ্বে তওহীদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর সেই প্রজ্ঞাবান ও যুগের চিকিৎসক- যিনি বিকৃত হৃদয়গুলোকে সত্যের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই দয়ালু ও অলৌকিক নিদর্শনের অধিকারী- যিনি মৃতদেরকে জীবনের সুধা পান করিয়েছেন, সেই অতিশয় দয়াবান ও কৃপাশীল- যিনি উম্মতের জন্য দুঃখ সয়েছেন এবং কষ্ট বরণ করেছেন, সেই বীর ও সাহসী- যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে এনেছেন, সেই সহনশীল ও নিঃস্বার্থ মানুষ- যিনি দাসত্বে মাথা অবনত করেছেন এবং নিজের অস্তিত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, সেই পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগর- যাঁর কেবল খোদার মহিমাই পছন্দ ছিল এবং অন্য সবাইকে নিজের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, করুণাময় খোদার কুদরতের সেই নিদর্শ ন- যিনি উম্মী বা নিরক্ষর হয়েও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সবার ওপর বিজয়ী হয়েছেন এবং প্র ত্যেক জাতিকে তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড, পৃ: ১৭)

এরপর তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন, "আজ পৃথিবীর বুকে তওহীদ নামক বস্তুটি মহানবী (সা.)-এর উম্মত ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাওয়া যায় না। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য এমন কোনো কিতাবের সন্ধান মেলে না, যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে আল্লাহ্র একত্ব বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম সম্মানের সাথে সেই সত্য খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করে।

প্রত্যেক জাতি নিজেদের কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের খোদা তিনিই, যিনি অনাদিকাল থেকে আছেন। তিনি অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় এবং নিজের চিরন্তন গুণাবলিতে তেমনই আছেন, যেমনটি পূর্বে ছিলেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড, পৃ: ১১৭-১১৮)

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ উম্মতে মুহাম্মদীয়াও তওহীদের এই মর্যাদাকে ভুলে যাচ্ছে এবং তাদের মাঝে সেই প্রকৃত তওহীদ আর অবশিষ্ট নেই, যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন এবং বড়ো বেদনার সাথে যার উপদেশ ও দিকনির্দেশনা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদান করেছেন।

খাঁটি তওহীদকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলির প্রতিও সেই বিশুদ্ধ ঈমান আর অবশিষ্ট নেই, যা একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এমন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের (আ.) অনুসারীদের কর্তব্য হলো তওহীদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা এবং এজন্য নিজেদের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করা। রমযান ইবাদতের বিশেষ মাস; এ মাসে বিশেষভাবে এ প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং এজন্য দোয়া করা প্রয়োজন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সমগ্র জীবন তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন- যদি আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করি, তবে আমাদেরও সে উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (সা.) কীভাবে চেষ্টা করেছেন এবং কত কষ্ট সহ্য করেছেন তা হযরত মু সলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা রসূ লে করীম (সা.)-কে বলেন,

" وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্! তুমি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে মানুষকে সতর্ক করো, কিন্তু প্রথমে তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো। কারণ তাদের ওপর তোমার দুটি অধিকার রয়েছে- একটি হলো, তারা অন্যদের মতোই ধ্বংসের পথে রয়েছে; আরেকটি হলো, তারা তোমার আত্মীয়স্বজন এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তোমার সঙ্গে সদাচরণ করেছিল। ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, Charity begins at home অর্থাৎ দানখয়রাত প্রথমে ঘর থেকেই শুরু হয়। একইভাবে ওয়ায-নসীহতের ধারাও সর্ব দা ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। বস্তুত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই নির্দেশ এভাবে পরিপালন করেন যে, তিনি (সা.) মক্কার প্র থা অনুযায়ী সাফা পাহাড়ে দাঁড়ান এবং বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি (সা.) আলে গালিবকে ডাকেন এবং তারা মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে চলে আসে। তখন আবু লাহাব মহানবী (সা.)-কে বলে, আলে গালিব তো এসে গেছে, আপনার যা বলার আছে বলে ফেলুন। কিন্তু তিনি (সা.) আবু লাহাবের কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন নি এবং লুয়াই গোত্রের লোকদের ডাক দেন।তারা পৌঁছে গেলে আবু লাহাব আবারও বলে, এখন তো লুয়াই গোত্রও এসে গেছে, এখন তো আপনি বলুন- আপনি কী বলতে চান। কিন্তু মহানবী (সা.) তার কথা গ্রাহ্য করার যোগ্য মনে করেন নি এবং আলে মুররাকে ডাক দেন, ফলে তারাও এসে পড়ে। এরপর তিনি (সা.) আলে কিলাব এবং আলে কুসাইকে ডাকেন, এক পর্যায়ে প্রায় সবাই সমবেত হয়ে গেল। আর যারা নিজেরা আসতে পারে নি, তারাও নিজেদের দূত পাঠায় যেন সে জেনে গিয়ে তাদের খবর দেয়- আজ তাদেরকে কী উদ্দেশ্যে সমবেত করা হয়েছে।যখন মক্কার সকল গোত্র কুরাইশসহ সমবেত হয়ে গেল, তখন রসূল করীম (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, দেখো, আমি যদি তোমাদের বলি-এই পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত- তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলে, কেন নয়! আমরা আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব, কারণ আমরা সর্বদা আপনাকে সত্যবাদী পেয়েছি, সত্যনিষ্ঠ পেয়েছি।মক্কার অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানেন, রসূল করীম (সা.)-এর এই প্র শ্নটি প্রকৃতপক্ষে কোনো অসম্ভব বস্তুকে সম্ভব বলে মেনে নেওয়ার দাবি করার মতো বিষয় ছিল। কারণ, মক্কাবাসীদের

গবাদিপশু উপত্যকায় চরে বেড়াত এবং সেটি এমন একটি এলাকা যেখানে কোনো সেনাবাহিনীর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ওই লোকদের ওপর তাঁর (সা.) সত্যবাদিতার এতই প্রভাব ছিল যে, তারা বলে, আমাদের চোখ এ কথা স্বীকার না করলেও আমরা আপনার কথা অবশ্যই মেনে নেব, কারণ আপনার সত্যবাদিতা আমাদের কাছে সর্বজনস্বীকৃত।যখন তারা রসুল করীম (সা.) সম্পর্কে একবাক্যে নিজেদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থাপ্রকাশ করে তখন তিনি (সা.) বলেন, তাহলে শোনো! আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিচ্ছি আর খবরটি হলো, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্,) তুমি ধ্বংস হও! এতটুকু কথার জন্যই তুমি আমাদেরকে একত্র করেছিলে? আর একইভাবে অন্যান্য লোকেরাও হাসিবিদ্রুপ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ” (তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৮২-৫৮৩)

কিন্তু এই বিদ্রুপ ও বিরোধিতা তাঁকে তওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি (সা.) অনবরত এই চেষ্টাতেই রত ছিলেন। যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, বিদ্রুপ করা হয়েছিল, এরপর তাঁর (সা.) বিরোধিতাও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর (সা.) বিরোধিতার ইতিহাসকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির আলোকে এভাবে বর্ণ না করেছেন:

“মহানবী (সা.) যতটা মহান কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর (সা.) বিরোধিতাও ঠিক ততটাই তীব্র হওয়া অবধারিত ছিল। কারণ তিনি (সা.) এমন এক যুগে আদিষ্ট হয়েছিলেন যখন অমানিশা ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং আলোর আগমনে অন্ধকারের বাহিনীর সর্বশক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করা অবধারিত ছিল। বাস্তবে এমনটিই হয়েছিল, অতীতের সকল নবীর তুলনায় তাঁর (সা.) বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল।এই বিরোধিতার বাহ্যিক কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিল, কুরাইশ চরম পর্যায়ের মূর্তিপূজারী জাতি ছিল এবং মূর্তিদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা তাদের অন্তরে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, এগুলোর বিরুদ্ধে একটি শব্দ শোনাও তাদের পক্ষে ছিল অসহনীয়। পবিত্র কা'বা ঘর, যা কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল, এই যালেমরা তাতেও শত শত মূর্তি জড়ো করে রেখেছিল এবং নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য এই মূর্তিগুলোরই মুখের দিকে চেয়ে থাকত। এরপর যখন ইসলাম এলো, তখন এর মূলনীতিই ছিল আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ এবং স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, কোনো মানুষ, গাছপালা, পাথর বা নক্ষত্র ইত্যাদির সামনে মাথা নত কোরো না।وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ (সূরা হামীম আস-সাজদাহ্: ৩৮) “বরং কেবল সেই সত্তার সামনেই মাথা নত করো, যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন।” শুধু তা-ই নয়, বরং কুরাইশের মূর্তি গুলোকে তাদের বক্তব্য অনুসারে ‘অবমাননাকর শব্দে’স্মরণ করা হতো এবং সেগুলোকে জাহান্নামের ইন্ধন সাব্যস্ত করা হতো। এসব কথা কুরাইশের সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তারা একজোট হয়ে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিল।”(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ১৩২-১৩৩)

আরো অনেক কারণ ছিল, কিন্তু এটিই ছিল প্রধান কারণ।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একজন নবী বা রসূল খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে লোকেরা যখন একটি কুশলী, সত্যবাদী, সাহসী এবং উন্নতিশীল দল হিসেবে দেখে, তখন তাঁর প্রতি সমসাময়িক জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর অন্তরে অবশ্যই এক প্র কার বিদ্বেষ ও হিংসার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি ধর্মের আলেম ও গদিনশিনরা তো চরম বিদ্বেষ প্র কাশ করে থাকে; কারণ এই খোদাভক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবে তাদের আয়-রোজগার ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঘাটতি দেখা দেয়। তাদের ছাত্র ও মুরিদরা তাদের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, কারণ তারা সমস্ত ঈমানি, নৈতিক ও জ্ঞানগত গুণাবলি সেই ব্যক্তির মাঝেই দেখতে পায় যিনি খোদার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন। যেসব মুরিদ পুণ্যময় স্বভাবের ও পুণ্যবান হয়ে থাকে, তারা নিজেদের পীরদের ছেড়ে সেইখোদাপ্রেমিক মানুষের দিকে ছুটে আসে।

অতএব, বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোকেরা বুঝতে পারে, জ্ঞান, সম্মান, তাকওয়া ও ধার্মিকতার যে মর্যাদা এসব আলেমকে দেওয়া হয়েছিল, তারা এখন আর তার যোগ্য নয় এবং তাদেরকে ‘নাজমুল উম্মাহ’ (উম্মতের নক্ষত্র), ‘শামসুল উম্মাহ’ (উম্মতের সূর্য) এবং ‘শায়খুল মাশায়েখ’ ইত্যাদি যে-সব সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো এখন আর তাদের জন্য মানানসই নয়। তাই এসব কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কারণ তারা নিজেদের ঈমান নষ্ট করতে চায় না। পবিত্র প্রকৃতির মান্যকারীদের কাজ তো এটিই হয়ে থাকে। পরিশেষে, এসব ক্ষতির কারণে আলেম ও মাশায়েখদের দল অনোন্যপায় হয়ে সবসময় নবী ও রসূলদের প্রতি হিংসা করে এসেছে। এর কারণ হলো, খোদার নবী ও মামুরদের সময়ে এদের মুখোশ চরমভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে এবং আর তাদের মাঝে নূর অতি স্বল্পই থাকে, আর খোদার নবী ও সত্যবাদীদের প্রতি তাদের শত্রুতা কেবলই স্বার্থ পরতামূলক হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র আঁটে; বরং অনেক সময় তারা নিজেদের অন্তরে এটি অনুভবও করে যে, তারা খোদার একজন পবিত্র হৃদয়ের বান্দাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে খোদার ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের সেসব কাজও- যা বিরোধিতামূলক ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে সর্বদা তাদের থেকে প্রকাশ পেতে থা কে- তা তাদের অন্তরের অপরাধী হবার বিষয়টিকে তাদের সামনে তুলে ধরতে থাকে; কিন্তু তারপরও হিংসার আগুনের দ্রুতগামী ইঞ্জিন তাদেরকে শত্রুতার গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এগুলোই ছিল সেই কারণ, যা মহানবী (সা.)-এর যুগে মুশরিক, ইহুদী এবং খ্রিষ্টান আলেমদেরকে কেবল সত্য গ্রহণ করা থেকেই বঞ্চিত রাখে নি, বরং চরম শত্রুতা করতেও প্ররোচিত করেছিল। অতএব, তারা কোনো উপায়ে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আর যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল, তাই তাদের বিরোধীরা সেই অহংকারের বশবর্তী হয়ে- যা স্বভাবতই এমন সব সম্প্রদায়ের অন্তরে ও মনমস্তিষ্কে গেঁথে থাকে যারা ধনসম্পদ, সংখ্যা, সম্মান ও মর্যাদায় নিজেদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে- তৎকালীন মুসলমানদের অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে চরম শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে। তারা চাইত না, এই ঐশী চারাগাছটি পৃথিবীতে প্র তিষ্ঠিত হোক; বরং তারা সেই সত্যবাদীদের ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল এবং কষ্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে নি। আর তাদের ভয় ছিল, পাছে এই ধর্ম দৃঢ় হয়ে যায় এবং এরপর এর অগ্রগতি আমাদের ধর্ম ও জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই ভয়ের কারণেই, যা তাদের অন্তরে এক ভয়ঙ্কর রূপে বসে গিয়েছিল, তাদের পক্ষ থেকে চরম জবরদস্তিমূলক ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং তারা বেদনাদায়ক উপায়ে অধিকাংশ মুসলমানকে শহীদ করেছিল। আর তেরো বছরের একটিদীর্ঘ যুগ ধরে তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কার্যকলাপই অব্যাহত ছিল এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খোদার বিশ্বস্ত বান্দা ও মানবজাতির জন্য গৌরবস্বরূপ লোকদেরকে সেই দুষ্ট নরপশুদের তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। এতিম শিশু এবং অসহায় ও দরিদ্র নারীদেরকে রাস্তাঘাটে ও অলিগলিতে জবাই করা হয়েছিল। এত কিছুর পরও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ভাবে এই জোর তাগিদ ছিল যে, কোনোভাবেই মন্দের মোকাবিলা কোরো না। সেই মনোনীত সত্যবাদীরা এমনটিই করেছিলেন। অলিগলি তাঁদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা ‘উহ্’ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি এবং তাদেরকে কুরবানীর পশুর মতো জবাই করা হয়েছিল, কিন্তু তারা ‘আহ্’ শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি।”

(গভর্মেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪-৫)

মক্কার কাফিররা তওহীদের বার্তা প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁকে (সা.) ভয়ও দেখিয়েছে এবং প্র লোভনও দিয়েছে, কিন্তু তাঁর (সা.) উত্তর এটাই ছিল যে, পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠাই তো আমার জীবনের লক্ষ্য, এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন: যখন বিরোধিতা তীব্র রূপ ধারণ করে এবং এদিকে রসূল করীম (সা.)ও তাঁর সাহাবীরা (রা.) দৃঢ়তার সাথে মক্কাবাসীদের কাছে খোদা তা'লার এই বার্তা পৌঁছাতে শুরু করেন যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা খোদা এক-অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই;যত নবী গত হয়েছেন তাঁরা সকলেই তাঁর তওহীদের ঘোষণা দিতেন এবং নিজ নিজ জাতিকে এই শিক্ষার দিকেই আহ্বান করতেন। তোমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান আনো, এসব পাথরের মূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করো, কেননা এগুলো একেবারেই অকেজো এবং এদের কোনো শক্তি নেই। হে মক্কাবাসীরা! তোমরা কি দেখতে পাও না, এদের সামনে যেসব উপঢৌকন বা নৈবেদ্য রাখা হয়, যদি এর ওপর মাছির ঝাঁক এসে বসে, তবে এই মাছিগুলোকে তাড়ানোর শক্তিও এদের নেই। কেউ যদি এদের ওপর আক্রমণ করে তবে এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। যদি কেউ এদের কোনো প্রশ্ন করে তবে এরা উত্তর দিতে পারে না। কেউ যদি এদের কাছে সাহায্য চায় তবে এরা তাকে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় খোদা তো প্রার্থনাকারীদের প্র য়োজন পূর্ণ করেন ,প্রশ্ন কারীদের উত্তর দেন, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করেন এবং নিজের শত্রুদের পরাস্ত করেন আর নিজ ইবাদতকারী বান্দাদেরকে মহান উন্নতি দান করেন। তাঁর কাছ থেকে এমন আলো আসে যা তাঁর উপাসকদের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। তাহলে তোমরা কেন এমন খোদাকে ছেড়ে প্রাণহীন প্রতিমার সামনে মাথা নত করছ এবং নিজেদের জীবন নষ্ট করছ? তোমরা কি দেখতে পাও না- খোদা তা'লার তওহীদকে বর্জন করার কারণে তোমাদের চিন্তাধারাও কলুষিত হয়েছে এবং অন্তরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে? তোমরা নানা ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষায় লিপ্ত আছো। অন্তরে কুসংস্কার জন্ম নিচ্ছে- তা কী কারণে? কারণ তোমরা তওহীদকে পরিত্যাগ করেছ। তোমাদের মাঝে হালাল ও হারামের পার্থ ক্যবোধ অবশিষ্ট নেই। ভালো ও মন্দের মাঝে তোমরা পার্থক্য করতে পারো না। তোমরা নিজ মায়েদের অসম্মান করো, নিজেদের বোন ও কন্যাদের ওপর অত্যাচার করো এবং তাদেরকে তাদের অধিকার দাও না। নিজ স্ত্রীদের সাথে তোমাদের আচরণ ভালো নয়। তোমরা

এতিমদের অধিকার আত্মসাৎ করো এবং বিধবাদের সাথে খারাপ আচরণ করো, গরিব ও দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করো এবং অন্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাও। মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে তোমাদের কোনো লজ্জা হয় না। চুরি ও ডাকাতির প্রতি তোমাদের কোনো ঘৃণা নেই। তোমাদের কাজ হলো জুয়া এবং মদে মত্ত থাকা। জ্ঞানার্জন এবং জাতীয় সেবার দিকে তোমাদের কোনো মনোযোগ নেই। এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্পর্কে আর কতকাল উদাসীন থাকবে? এসো, নিজেদের সংশোধন করো আর অন্যায় ছেড়ে দাও। এসব মন্দ তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, এগুলোর সংশোধন করো।

আজও যারা এসব মন্দের ধারক রয়েছে, তা তওহীদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই। যে-সব জাতির মাঝে এসব পাপ রয়েছে, যদিও তাদের মাঝে দু-একটি ভালো দিক থাকে, তবুও আমি যে-সব মন্দের কথা পড়ে শোনালাম তার অনেকগুলোই তাদের মাঝে বিদ্যমান। এর কারণ হলো, তারা তওহীদ থেকে দূরে সরে আছে; আর দুর্ভাগ্যবশত কিছু মুসলমানেরও একই অবস্থা।

এরপর তিনি [হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)] বলেন, খোদার নৈকট্য লাভের উপায় হলো, প্রত্যেক প্রাপক ব্যক্তিকে তার হক (অধিকার) প্রদান করো। এটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। খোদা যদি সম্পদ দিয়ে থাকেন, তবে দেশ ও জাতির সেবা এবং অসহায় ও গরিবদের উন্নতির জন্য তা ব্যয় করো। নারীদের সম্মান করো এবং তাদের অধিকার আদায় করো। এতিমদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আমানত মনে করো এবং তাদের দেখাশোনা করাকে উচ্চস্তরের পুণ্য বলে গণ্য করো। বিধবাদের সহায় হও, পুণ্য ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করো। শুধু ন্যায় ও সুবিচারই নয়, বরং দয়া ও অনুগ্রহকে নিজেদের রীতি বানাও। [কেবল সুবিচার নয়, বরং দয়াও থাকতে হবে, অনুগ্রহও থাকতে হবে; এটিই একজন মু'মিনের জন্যশিক্ষা।] এই পৃথিবীতে তোমাদের আগমন যেন বৃথা না যায়। নিজেদের পেছনে ভালো কীর্তি রেখে যাও, যেন চিরস্থায়ী পুণ্যের বীজ বপন করা যায়। অধিকার আদায় ক রার মাঝে নয়, বরং ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ পরতার মাঝেই প্র কৃত সম্মান নিহিত। [শুধু অধিকার আদায় করার চেষ্টা কোরো না, বরং কুরবানী ও আত্মত্যাগও জরুরি।] অতএব তোমরা কুরবানী করো, খোদার নিকটবর্তী হও। খোদার বান্দাদের প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করো যেন খোদার দরবারে তোমাদের অধিকার স্বীকৃত হয়।"

এগুলোই হলো প্রকৃত তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নিদর্শন। এটিও তিনি (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, নিঃসন্দেহে আমরা দুর্বল; কিন্তু আমাদের দুর্বলতার দিকেদেখো না। উর্ধ্বলোকে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে ন্যায়ের পাল্লা স্থাপন করা হবে এবং সুবিচার ও দয়ার রাজত্ব কায়েম করা হবে, যেখানে কারো ওপর যুলুম করা হবে না, ধর্মের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না,নারী ও দাসদের ওপর যে-সব যুলুম হয়ে আসছে, তা মুছে ফেলা হবে এবং শয়তানের রাজত্বের স্থলে এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

যখন এই শিক্ষাগুলো বার বার মক্কাবাসীদের শোনানো আরম্ভ হলো এবং ভদ্র স্বভাবের লোকদের আকর্ষণ ইসলামের প্রতি বাড়তে লাগল, তখন একদিন মক্কার সরদাররা একত্রিত হয়ে তাঁর (সা.) চাচা আবু তালিবের কাছে এলো এবং তাঁকে বলল, আপনি আমাদের নেতা এবং আপনার কারণেই আমরা আপনার ভাতিজা মুহাম্মদকে (সা.) কিছু বলি নি। এখন আপনার সাথে আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালা করার সময় এসে গেছে। হয় আপনি তাকে বোঝান এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করুন- সে আসলে আমাদের কাছে কী চায়? আর তার আকাঙ্ক্ষা যদি সম্মান লাভের হয়, তবে আমরা তাকে আমাদের সরদার বানাতে প্রস্তুত আছি। যদি সে সম্পদের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সম্পদের কিছু অংশ তাকে দিতে প্রস্তুত আছি। যদি তার বিয়ের ইচ্ছা থাকে, তবে মক্কার যে মেয়েকেই তার পছন্দ হয়- সে তার নাম বলুক- আমরা তার সাথে তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। এর বিনিময়ে আমরা তার কাছে কিছুই চাই না এবং কোনো কিছু থেকে বারণও করি না। আমরা শুধু এতটুকু চাই, সে যেন আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলা ছেড়ে দেয়। সে নির্দ্বিধায় বলুক- খোদা এক; কিন্তু এটি যেন না বলে যে, আমাদের মূর্তিগুলো মন্দ। সে যদি এতটুকু কথা মেনে নেয়, তবে তার সাথে আমাদের আপোশ হয়ে যাবে। আপনি তাকে বোঝান এবং আমাদের প্রস্তাব গ্রহণে তাকে রাজি করান। নচেৎ দুটি বিষয়ের একটি হবে; হয় আপনাকে আপনার ভাতিজাকে ছাড়তে হবে, নতুবা আপনার জাতি আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকে পরিত্যাগ করবে। আবু তালিবের জন্য এ কথাটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। আরবদের কাছে টাকা-পয়সা তো অল্পই থাকত, তাদের সমস্ত আনন্দ তাদের নেতৃত্বের মাঝেই নিহিত ছিল। সরদাররা জাতির জন্য বেঁচে থাকত এবং জাতি সরদারদের জন্য বেঁচে থাকত। এ কথা শুনে আবু তালিব অস্থির হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার জাতি আমার কাছে এসেছিল এবং তারা আমাকে এই বার্তা দিয়েছে। আর একই সাথে তারা আমাকে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, যদি তোমার ভাতিজা এসব কথার কোনো একটিতেও রাজি না হয়, তবে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তাবই দেওয়া হয়ে গেছে; আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা এই সব কিছু দিতে প্রস্তুত আছি। এরপরও সে যদি নিজের রীতিনীতি পরিহার না করে, তবে আপনার কাজ হলো তাকে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি আপনি তাকে ছাড়তে প্রস্তুত না হন, তাহলে আমরা আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকে ছেড়ে দেবো।

আবু তালিব যখন এ কথা বলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তাঁর অশ্রু দেখে রসূল করীম (সা.)-এর চোখেও পানি এসে যায় এবং তিনি (সা.) বলেন, হে আমার চাচা! আমি এ কথা বলছি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে থাকুন। আপনি নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন এবং আপনার জাতির পক্ষ অবলম্বন করুন। কিন্তু আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার কসম খেয়ে বলছি! তারা যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চাঁদকে আমার বামে এনেও দাঁড় করিয়ে দেয়, তবুও আমি খোদা তা'লার তওহীদের প্রচার থেকে বিরত হতে পারব না। আমি আমার কাজে রত থাকব, যতক্ষণ না খোদা আমাকে মৃত্যু দান করেন। আপনি নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিন।

ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এই উত্তর আবু তালিবের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বুঝতে পারেন যে, যদিও আমি ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করি নি, কিন্তু এরূপঈমানের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পাওয়াটাই তো সব সম্পদের চেয়ে বড়ো সম্পদ! আর তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা! যাও এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। জাতি যদি আমাকে ছেড়ে দিতে চায় তবে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিক; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনেয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৯-২০২)

তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে সব ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন এবং এই প্রেরণাই তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) মাঝেও সৃষ্টি করেছিলেন, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও লিখেছেন।

তারা নিজেদের গর্দান কাটিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা 'আহাদ, আহাদ' (এক, এক) ঘোষণা অব্যাহত রেখেছেন, একই সাথে যুলুম সহ্য করেছেন এবং নিজেদের জীবন কুরবানী করেছেন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

মক্কার কাফিরদের যে-সব মন্দের কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাদের তওহীদ থেকে দূরে থাকার কারণে এবং শিরকের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। আজও যে-সব জাতি এবং যেসব মানুষের মাঝে এসব পাপ রয়েছে, তা তওহীদ থেকে দূরে থাকার কারণেই রয়েছে। সুতরাং এমন পরিস্থি তিতে আমাদের কাজ হলো, আমরা যেন তওহীদের ঘোষণা করতে থাকি, এবং এই তওহীদের বার্তা যেমন পৌঁছাব, তেমনিভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থাতেও একটি স্পষ্ট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করব। তবেই আমরা প্রকৃত তওহীদ মান্যকারী এবং খোদা তা'লার নির্দেশ পালনকারী আখ্যায়িত হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন-ঐশ্বর্য দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেও না। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

ওয়াকফীনে নও মেয়েদের ক্লাসের প্রশ্নোত্তর (শেষাংশ..)

একজন মেয়ে প্রশ্ন করল: আকীকা-তে ছেলের জন্য দুই ভাগ (পশু) এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করার পেছনে কী হিকমত আছে?

উত্তরে হযরত মেয়েটিকে সম্বোধন করে বললেন: তাহলে তুমি এ কথাও বলতে পারো যে, উত্তরাধিকারেও ছেলের দুই ভাগ আর মেয়ের এক ভাগ কেন? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এর কারণ হলো ছেলেদের সাধারণত বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাকে বাইরে যেতে হয় এবং বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাই হয়তো তার জন্য দুই ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন-ছেলের জন্য দুই ভাগ এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ। তবে এর সুনির্দিষ্ট হিকমত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন: তোমরা কৃতজ্ঞ হও যে, এক ভাগ পাওয়ার পরও মেয়েরা অনেক সময় বেশি নেক হয়। সম্ভবত এই নেকীর কারণেই তাদের জন্য কম সদকাই যথেষ্ট হয়ে যায়।

আরেকজন মেয়ে প্রশ্ন করল: মানুষ কেন ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে?

উত্তরে হুযুর (আই.) বলেন: আজকের দিনে অনেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী-যেমন আল-কায়েদা, তালেবান, বোকো হারাম এবং অন্যান্য নতুন নতুন গোষ্ঠী-এদের অধিকাংশই নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এ কারণেই মানুষ মনে করে যে ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদ একই জিনিস। আমাদের দায়িত্ব হলো এই ভুল ধারণা দূর করা এবং পরিষ্কারভাবে বোঝানো যে এ দু'টি কখনোই এক নয়।

হযরত বলেন: এখানে বুকস্টলে "Pathway to Peace"নামে একটি বই রয়েছে। এতে আমার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে দেওয়া বক্তৃতাগুলো সংকলিত আছে, যেখানে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদকে এক করা উচিত নয়-এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। যারা এই দুটিকে এক করে, তাদের এতে নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকে। তাই তোমরা এই বইটি কিনে পড়ো। ওয়াক্‌ফে নওদের জন্য এটি স্বল্পমূল্যে দেওয়া উচিত। এতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে, এবং তোমরা প্রতিটি বিষয়ে দিকনির্দেশনা পাবে।

হযরত আরও বলেন: ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম কখনো অন্যায়ভাবে যুদ্ধ শুরু করেনি এবং কখনো সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেনি। যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে-এমনকি শত্রুদেরও-ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন জুলুম করতে নিষেধ করেছে এবং বলেছে যে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। যদি কেউ একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল।

তিনি আরও বলেন: আজ যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তারা আসলে মুসলমানদেরই হত্যা করছে। পাকিস্তান ও ইরাকের মতো জায়গায় হামলাগুলোতে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে মুসলমানরাই বেশি নিহত হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে। এমনকি গির্জায় হামলার ক্ষেত্রেও কিছু খ্রিস্টান মারা গেলেও, সামগ্রিকভাবে বেশি মুসলমানই নিহত হচ্ছে।

হযরত বলেন: যখন আহমদিদের হত্যা করা হয় এবং এরপর বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ চলতেই থাকে, তখন বোঝা যায় যে এরা নিজেরাই সন্ত্রাসী-একজন আরেকজনকে হত্যা করছে, যার কোনো অনুমতি নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ এরা মুসলমানদেরই হত্যা করছে। কুরআনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

হযরত বলেন: ইসলামের অর্থই হলো শান্তি। যদি তোমরা এম.টি.এ দেখো-এবং ওয়াক্‌ফে নওদের তা দেখা উচিত-তাহলে তোমরা এ বছরের যুক্তরাজ্যের জালসা সালানায় আমার শেষ ভাষণ শুনে থাকবে, যেখানে আমি ব্যাখ্যা করেছি ইসলাম কী, প্রকৃত মুসলমান কে, এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী। তোমরা "Pathway to Peace"বইটি নিজে পড়ো এবং অন্যদেরও দাও, যারা বলে ইসলাম উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা দেয়। এতে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে পারবে।

আরেকজন ওয়াক্‌ফে নও মেয়ে প্রশ্ন করল: যখন ওয়াক্‌ফে নও শিশুরা বড় হয়, তখন কি তারা সাধারণ মানুষের মতো যেকোনো চাকরি করতে পারে?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি জামাআত অনুমতি দেয়, তাহলে তারা করতে পারে; অন্যথায় তাদের জামাআতের সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মেয়েদেরও জামাআতের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতে হবে। যদি জামাআত বলে যে এই মুহূর্তে তোমাদের প্রয়োজন নেই, তাহলে কিছু সময়ের জন্য চাকরি করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অনুমতি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হযরত আরও বলেন: এখনো পর্যন্ত তোমাদের ওয়াক্‌ফে নও প্রশাসন যথাযথভাবে এ বিষয়টি বোঝায়নি যে জামাআতের অনুমতি ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। আমি বারবার নির্দেশ দিয়েছি যে, যখন তোমরা পনেরো বছর বয়সে পৌঁছাবে, তখন তোমাদের ওয়াক্‌ফের ফর্ম পূরণ করে নিজেদের পেশ করবে। এরপর যখন তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখন আবার নিজেদের পেশ করবে এবং জানাবে যে তোমরা শিক্ষা সম্পন্ন করেছ, তোমাদের ডিগ্রি ও যোগ্যতা কী, এবং জিজ্ঞেস করবে এখন কী করা উচিত।

তারপর তোমাদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে-তোমরা কি নিজের পেশা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জামাআতের সেবা করবে, নাকি পুরোপুরি নিজেদের জামাআতের জন্য উৎসর্গ করবে। এরপর জামাআত যেখানে প্রয়োজন মনে করবে, সেখানে তোমাদের সেবা গ্রহণ করবে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল: কোন কোন পেশায় ওয়াকফে নও মেয়েদের প্রয়োজন রয়েছে?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন যে তিনি এ বিষয়টি বহুবার ব্যাখ্যা করেছেন-তোমরা তাঁর ক্লাসগুলো শোনো। তিনি বলেন, চিকিৎসা, শিক্ষাদান, ইতিহাস এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-এই সকল ক্ষেত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত। তবে বিশেষভাবে শিক্ষক ও ডাক্তারের প্রয়োজন বেশি। এছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানের (linguistics) প্রয়োজন রয়েছে, যাতে জামাআতের বই-পুস্তক অনুবাদ করা যায়। উর্দু ভাষায় বিপুল পরিমাণ বই-পুস্তক রয়েছে যা এখনও ইংরেজিতে অনুবাদ করা বাকি। তাই উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা উচিত, এবং আরবি ও অন্যান্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করাও জরুরি, যাতে অনুবাদের কাজে সহায়তা করা যায়।

হুযূর আনোয়ার আরও বলেন, শিক্ষাদানের পাশাপাশি চিকিৎসা একটি অত্যন্ত ভালো ক্ষেত্র। এছাড়া স্থাপত্য (architecture) রয়েছে। যদি কারও পরিসংখ্যান (statistics) ভালো হয় এবং সে এতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে এই ক্ষেত্রেও যেতে পারে। এছাড়া কম্পিউটার ও গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রেও মেয়েরা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, হুযূর কোন দেশে যেতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন, তাঁর নির্দিষ্ট কোনো স্থানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবে যদি পছন্দের কথা বলা হয়, তাহলে তিনি সেই সব দেশ পছন্দ করেন যেখানে আহমদিরা আছে, কারণ তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। তিনি সফরে যান ঘোরার জন্য নয়, বরং জামাআত ও আহমদিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করল যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সাহেবজাদা আবদুল লতিফ শহীদের শাহাদাত সম্পর্কে বলেছিলেন: "হে কাবুলের ভূমি! তুমি সাক্ষী থাক যে তোমার উপর এক ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। হে দুর্ভাগা ভূমি! তুমি এই মহান জুলুম -এর স্থান।" এখন যেহেতু পাকিস্তানেও অনেক শাহাদাত ঘটছে এবং আহমদিরা প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তাহলে কি পাকিস্তানও সেই একই শ্রেণিতে পড়ে?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন: প্রথমত, আমি তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। তুমি বারো বছর বয়সে এত সুন্দরভাবে উদ্ধৃতি দিতে পারছো, মাশাআল্লাহ। এই ঘটনাটি হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর যুগে ঘটেছিল, এবং এখন তোমরা সেই ভূমির অবস্থা দেখতে পারো যাকে আল্লাহর দৃষ্টিতে ধিক্কৃত বলা হয়েছিল-সেখানে কোনো শান্তি বা স্থিতিশীলতা নেই। সেখানে অস্থিরতা রয়েছে, এবং পরিস্থিতি কখনোই ভালো ছিল না। পাকিস্তানের অবস্থাও অনুরূপ। যদি আহমদিরা শহীদ হচ্ছেন, তা কয়েক সপ্তাহ পরপর ঘটে, অথবা ২৮ মে-র মতো ঘটনায় অনেকেই শহীদ হন; কিন্তু এর বাইরে প্রতিদিন মানুষ একে অপরকে হত্যা করছে। পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, এবং বিশ্বে এটি সন্ত্রাসবাদের জন্য পরিচিত-এটি সেই ধিক্কৃতত অবস্থারই প্রতিফলন। এটি ছিল একজন নবীর বাণী, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন, এবং এখন বাস্তবে এখানেও অনুরূপ পরিস্থিতি প্রকাশ পাচ্ছে। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সঙ্গে তাদের আচরণের কারণে তারা এই পৃথিবীতেও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, একজন খলিফা কীভাবে নির্বাচিত হন?

হুযূর আনোয়ার ব্যাখ্যা করেন যে খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি ইলেক্টোরাল কলেজ রয়েছে। এই ইলেক্টোরাল কলেজে জাতীয় আমিরগণ, নির্দিষ্ট সংখ্যক মুরব্বি, এবং রাবওয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন, যেমন তেহরিক-এ-জাদীদ এবং কেন্দ্রীয় আঞ্জুমান। পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের জ্যেষ্ঠ পুত্ররাও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতেন, কিন্তু এখন আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

এই ইলেক্টোরাল কলেজই খলিফা নির্বাচন করে। কিছু নাম প্রস্তাব করা হয় এবং পুরো প্রক্রিয়াটি বন্ধ দরজার আড়ালে সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন, তিনি সাধারণত সাংবাদিকদের বোঝান যে এই নির্বাচন পোপ নির্বাচনের মতো, তবে কোনো বাহ্যিক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আমি তোমাদিগকে উপার্জন ও শিল্পকার্য করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকদের অনুগামী হয়ো না যারা সংসারকেই সব কিছু মনে করে। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

সংকেত ছাড়া। যে ব্যক্তি সর্বাধিক ভোট পান, তাকেই ইলেক্টোরাল কলেজ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে। প্রার্থী কেবল উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বাইরের কেউও নির্বাচিত হতে পারেন এবং পরে তাকে সামনে আনা হয়। তিনি আরও বলেন, এমনকি তাঁর নিজেরও জানা ছিল না যে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, অথচ তিনি খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল যে, যখন তারা অ-আহমদিদের কাছে তবলীগ করে এবং কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়, তখন তারা বলে যে আহমদিদের কুরআনের অনুবাদ ভিন্ন এবং তারা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে।

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন: তাদের জিজ্ঞেস করো, কোন আয়াতের অনুবাদ তাদের কাছে ভুল মনে হয়। মাত্র দুই-তিনটি আয়াতে ব্যাখ্যার পার্থক্য রয়েছে-যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত আয়াত। তারা বলেন তাঁকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর আমরা বলি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই কয়েকটি আয়াত ছাড়া বাকি পুরো কুরআনের অনুবাদ একই।

হুযূর আনোয়ার আরও বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পূর্ববর্তী অনেক বুজুর্গ আলেমও একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমরা দিই, এবং আমাদের বই-পুস্তকে তাদের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যেসব আয়াত সম্পর্কে বিরোধীরা বলে অনুবাদ ভিন্ন, সেসব আয়াতের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীর দেখা উচিত, যেখানে পূর্ববর্তী আলেমদের উদ্ধৃতি রয়েছে, অথবা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর তফসীরে কাবীর পড়া উচিত, যেখানে এসব রেফারেন্সও উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে একটি ছোট বইও রয়েছে যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, জীবন এবং পুনরাগমনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ছোট ছোট বই রয়েছে, যা ওয়াকফে নও সেক্রেটারি বা লাজনা থেকে সংগ্রহ করা উচিত। যুক্তরাজ্যে এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ ও মুদ্রণ শুরু হয়েছে, তাই অন্য স্থানেও এগুলো সংগ্রহ ও মুদ্রণ করা উচিত, যাতে প্রমাণসমূহ হাতে থাকে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, সন্তানদের তরবিয়তের-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন: এমন আদর্শ স্থাপন করো যাতে শিশুরা তা দেখে অনুসরণ করে। নামাজের ক্ষেত্রে নিয়মিত হও। কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করো-মা ও বাবা উভয়ই তিলাওয়াতকারী হও। শুধু সন্তানদের নেক কাজের উপদেশ দিলেই হবে না; বরং বাবা-মাকেও নিজে নেক কাজ করতে হবে। সত্য বলার প্রবণতা বাবা-মার মধ্যে থাকতে হবে এবং মিথ্যাকে সহ্য করা যাবে না। যখন সন্তান দেখবে যে তার বাবা-মা নিজেরাও সত্য কথা বলে এবং সত্যকে ভালোবাসে, তখন তাদের নিজের আমলই সন্তানদের নেক বানাবে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, অনেক অ-মুসলিম অস্ট্রেলিয়ান মনে করে ইসলাম একটি ধর্ম নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রথা।

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে কুরআন খুলে দেখাও। এতে শত শত স্থানে ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়-একটি পরিবারের মৌলিক একক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত।

হুযূর আনোয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, "তাকওয়া" শব্দটি কুরআনে বারবার এসেছে-সম্ভবত শতাধিক বার বা তারও বেশি। যদি এটি কেবল একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হতো, তাহলে আল্লাহ কেন এতবার তাকওয়ার উপর জোর দিতেন? তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ বলেন, তোমাদের তাঁর সকল নির্দেশ পালন করা উচিত। কুরআন অনুযায়ী তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো: "আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।" সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং তাঁর ইবাদত করা, যার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, যখন কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে জীবনের উদ্দেশ্য ইবাদত, তখন কীভাবে বলা যায় যে ইসলাম কেবল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা, ধর্ম নয়?

হুযূর আনোয়ার আরও বলেন: ধর্মের উদ্দেশ্য কী? কুরআনের আলোকে এর দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে-প্রথমত, মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করা, এবং দ্বিতীয়ত, একজন মানুষের অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব নির্ধারণ করা। সুতরাং এটিকে কেবল সংস্কৃতি বলা যায় না; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। তিনি পরামর্শ দেন যে এই ভুল ধারণা দূর করতে হবে এভাবে বোঝানোর মাধ্যমে যে কুরআন শেখায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, কেবল সাংস্কৃতিক সুবিধা লাভ করা নয়।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছিল যে হযরত খলিফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.) বলেছেন যে আহমদী শিশুদের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও গন্তব্য(landmark) থাকা উচিত, যেমন একটি নোবেল পুরস্কার লাভ করা।

হুজুর (আই.) উত্তরে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ কথা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেছিলেন। পরে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবেও তাঁর এক মজলিসে উল্লেখ করেছিলেন যে জামা'আতে আহমদিয়ার শতবর্ষ জুবিলির বছর আসন্ন, এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস(রহ.) এই আহ্বান জানিয়েছিলেন যে জুবিলির বছর আসার সময় জামা'আতে শুধু একজন আবদুস সালাম নয়, বরং ড. আবদুস সালামের মানের প্রায় ১০০ জন ব্যক্তি থাকা উচিত।

ড. আবদুস সালাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর যুগে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তাই তিনি পুনরায় এই আহ্বান স্মরণ করিয়ে দেন যে ড. আবদুস সালামের মানের আরও মানুষ হওয়া উচিত।

হুজুর (আই.) বলেন: এরপর আমি বারবার আমার বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও ক্লাসে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে তারা যেন গবেষণায় যায় এবং তাদের ন্যূনতম লক্ষ্য যেন নোবেল পুরস্কার হয়।

মেয়েটিকে সম্বোধন করে হুজুর (আই.) বলেন যে তিনি তার বক্তব্য সংশোধন করে দিয়েছেন, এখন সে যেন তার প্রশ্ন বলে। তখন মেয়েটি জিজ্ঞেস করে যে, ওয়াকফে নও মেয়েরাও কি গবেষণায় যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (আই.) বলেন যে তারা মেডিকেল গবেষণায় যেতে পারে। তারা ইতিহাসসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেতে পারে-যে ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও সক্ষমতা আছে, সেই ক্ষেত্রে তারা গবেষণা করতে পারে। তারা সেই মান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং তাদের সেই মানে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত।

আরেকটি মেয়ে প্রশ্ন করেছিল যে তার বিয়ে একজন মুরব্বী সাহেবের সঙ্গে হয়েছে। একজন ওয়াকফে নও এবং একজন মুরব্বীর স্ত্রী হিসেবে তার কী দায়িত্ব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (আই.) বলেন: তোমার দায়িত্ব দ্বিগুণ হয়ে যায়। তুমি তোমার ঘর-সংসারও সামলাবে এবং নিজেকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে তুলবে। যেখানে মুরব্বীর নিয়োগ হয়, সেখানে মানুষ তোমাকে দেখবে। তোমাকে সব দিক থেকে আদর্শ হতে হবে-নামাজের ক্ষেত্রে, নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার কাজে, তোমার পর্দা পালনে এবং সর্বদিক থেকে। একজন মুরব্বীর স্ত্রীকে আদর্শ হতে হবে এবং তার মধ্যে নম্রতা ও বিনয় থাকতে হবে-বরং অনেক বেশি বিনয় থাকা উচিত।

নিকাহ্‌র ঘোষণা

নামাজ আদায়ের পর হুযূর-এ-আনোয়ার (আই.) একটি নিকাহ্‌র ঘোষণা করেন। নিকাহ্‌র খুতবা প্রদান ও নির্ধারিত আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের পর হুযূর (আবা) বলেন:

"এই মুহূর্তে আমি একটি নিকাহ্‌র ঘোষণা করব, যা হলো মুকাররমা লুবনা সোসন বাজওয়া, মুকাররম মুবাশির মজীদ বাজওয়া সাহেবের কন্যা-যিনি একজন মুরব্বি-তার সঙ্গে মকরম মুবারক মজীদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র সম্মানিত মুহাম্মদ ফাতেহ বাজওয়ার। এই বিবাহ এক লক্ষ পাকিস্তানি রুপি হক-মেহরের ওপর নির্ধারিত হয়েছে। যদি নিকাহ্ ও বিবাহের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তা সফল হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বারবার এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে একে অপরের অধিকারসমূহ আদায় করো। এটি কনের পক্ষের দায়িত্ব, তেমনি বরের পক্ষেরও দায়িত্ব। কনে ও বর উভয়েরই কর্তব্য যে তারা শুধু নিজেদের সম্পর্কই বজায় রাখবে না, বরং পরস্পরের আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকেও রক্ষা করবে। তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন যে, সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বিবাহের সময় যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয়-কখনও পরিবারগুলো একে অপরকে জানে, আবার কখনও জানে না-সর্বক্ষেত্রে নিজের অবস্থা ও তথ্য সত্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত, যাতে পরবর্তীতে না কনের কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয়, না বরের, এবং না উভয় পরিবারের। কারণ অনেক সময় এমন হয় যে, সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভুল তথ্য প্রদান করা হয়, এবং পরে যখন কোনো কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন অভিযোগ শুরু হয়-অমুক জায়গায় মিথ্যা বলা হয়েছে কিংবা তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে, যদি তোমরা সঠিকভাবে সম্পর্ক রক্ষা করতে চাও, সম্পর্ককে স্থায়ী রাখতে চাও এবং নেক বংশধারা প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে পার্থিব বিষয়কে প্রাধান্য দিও না; বরং সেই সব বিষয়কে গুরুত্ব দাও যা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। আর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হলো সত্যবাদিতা, এবং তিনি মিথ্যাকে শিরকের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও, হুকুকুল ইবাদ (মানবাধিকারের) আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন যে, এর ভিত্তি শুরু হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে-অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক থেকে। এবং শুধু নিজের রক্তের সম্পর্কের প্রতিই নয়, বরং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। যখন এই বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে, তখন সমাজে ভালোবাসা, মমতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

অতএব, যে সম্পর্কগুলো এই ভিত্তির ওপর-অর্থাৎ তাকওয়ার ওপর-প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোই স্থায়ী হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অধিকারী হয়। আল্লাহ্ করুন, আজ যে সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেটিও যেন এই নীতিগুলোর প্রতি যত্নবান হয়, স্থায়ী হয় এবং আল্লাহ্ এর মাধ্যমে নেক সন্তান দান করেন।

এখন এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর আমি নিকাহ্‌র ঘোষণা করছি।"

এরপর নিকাহ্‌র খুতবার পর হুযূর-এ-আনোয়ার (আই.) উভয় পক্ষের মধ্যে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন করান এবং বলেন যে, এখন এই সম্পর্কের বরকতের জন্য দোয়া করা উচিত।

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{২৫}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । কাজী আমির হুসাইন সাহেব আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তার প্রথম স্ত্রীর একটি ছেলে মারা যায়। তার মা (অর্থাৎ ছেলেটির মা) অত্যন্ত আহাজারি ও বিলাপ করতে থাকে, এবং শিশুটির নানীও একই ধরনের আচরণ করে। আমি তাদের অনেক নিষেধ করেছি, কিন্তু তারা বিরত হয়নি। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ছেলেটির জানাজা পড়াতে এলেন, জানাজার পর তিনি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য দিলেন। শেষে তিনি বললেন, "কাজী সাহেব, আমার এই উপদেশটি আপনার ঘরেও পৌঁছে দিন।" আমি বাড়ি ফিরে আমার স্ত্রীকে প্রতিশ্রুত মসীহের সেই বক্তব্য শুনালাম। এরপর তার আরও দুই-তিনটি ছেলে মারা যায়, কিন্তু সে শুধু চোখের পানি ফেলেছে, এর বাইরে আর কোনো এমন আচরণ করেনি।

{৩৫} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মাওলভী শের আলী সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, একবার প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কাদিয়ান থেকে গুরদাসপুর যাওয়ার পথে বাটালায় থামেন। সেখানে এক ব্যক্তি, যিনি কাদিয়ানে তাকে খুঁজে না পেয়ে বাটালায় ফিরে এসেছিলেন, তার কাছে এসে কিছু ফল উপহার হিসেবে পেশ করেন। সেই ফলের মধ্যে আঙুরও ছিল। তিনি আঙুর খেয়ে বললেন, "আঙুরে টকভাব থাকে, কিন্তু এই টকভাব নাকের সর্দির জন্য ক্ষতিকর নয়।" তারপর তিনি বললেন, "এইমাত্র আমার মনে আঙুর খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" তিনি আরও বললেন, " বহুবার আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, হৃদয় যা চায়, আল্লাহ্ তা ব্যবস্থা করে দেন।" এরপর তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার সফরে যাওয়ার সময় তার মনে আখের টুকরো (পোন্ডা) খাওয়ার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু পথে কোথাও আখ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে কিছুক্ষণ পরই এমন এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, যার কাছে ওই ধরনের আখ ছিল, এবং আমরা তা পেয়ে যাই।

{৩৬} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, প্রাথমিক যুগে একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) গুরুতর অসুস্থ হন। কেউ মির্জা সুলতান আহমদ ও মির্জা ফজল আহমদকে খবর দেয়, এবং তারা দুজনই এসে উপস্থিত হন। এরপর তাদের সামনেই আবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওপর সেই রোগের আক্রমণ হয়। ওয়ালিদা সাহেবা বলেন, তখন তিনি দেখেন যে মির্জা সুলতান আহমদ নীরবে তার খাটের পাশে বসে ছিলেন, আর বারবার মির্জা ফজল আহমদের চেহারার রং পরিবর্তন হচ্ছিল। তিনি কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে দৌড়াচ্ছিলেন; কখনো নিজের পাগড়ি খুলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পায়ে বাঁধছিলেন, আবার কখনো পা টিপে দিচ্ছিলেন। উৎকণ্ঠায় তার হাত কাঁপছিল।

{৩৭} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করেন যে, যখন মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেল এবং কাদিয়ানের সকল আত্মীয়স্বজন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কঠোর বিরোধিতা করল এবং তার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালাতে থাকল, এবং সবাই মুহাম্মদী বেগমের পিতা আহমদ বেগের পক্ষ নিল, এবং নিজেরাই চেষ্টা করে মেয়েটির বিয়ে অন্যত্র দিয়ে দিল, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মির্জা সুলতান আহমদ ও মির্জা ফজল আহমদ-উভয়ের কাছে পৃথক পৃথক চিঠি লিখে জানালেন যে, এরা সবাই তার কঠোর বিরোধিতা করেছে। "এখন তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি আমাদের কবরও আর তাদের সঙ্গে একত্র হতে পারে না। সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাও-যদি তোমরা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও, তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে; আর যদি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি তোমাদের ত্যাগ করব।" ওয়ালিদা সাহেবা বলেন, মির্জা সুলতান আহমদ উত্তর দেন যে, তায়ী (কাকিমা) সাহিবার অনুগ্রহ তার ওপর রয়েছে, তাই তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন না। কিন্তু মির্জা ফজল আহমদ লিখলেন যে, তার সম্পর্ক শুধু তাঁর (প্রতিশ্রুত মসীহ)সঙ্গেই, তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন প্রতিশ্রুত মসীহ উত্তর দিলেন যে, যদি তা সত্য হয়, তবে তিনি যেন তার স্ত্রী-মির্জা আলী শেরের কন্যা (যিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং মির্জা আহমদ বেগের ভাগ্নি ছিলেন)-তাকে তালাক দেন। মির্জা ফজল আহমদ সঙ্গে সঙ্গে তালাকনামা লিখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

ওয়ালিদা সাহেবা বলেন, এরপর ফজল আহমদ বাইরে থেকে এলে আমাদের কাছেই থাকতেন, কিন্তু শেষে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ফিতনার কারণে ধীরে ধীরে আবার তাদের দলে ফিরে যান। ওয়ালিদা সাহেবা বলেন, ফজল আহমদ খুব লাজুক ছিলেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনে চোখ তুলতেন না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার সম্পর্কে বলতেন যে, ফজল আহমদ সরল স্বভাবের এবং তার মধ্যে ভালোবাসার গুণ আছে, কিন্তু অন্যদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, যখন ফজল আহমদের মৃত্যুসংবাদ এল, সেই রাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রায় একেবারেই ঘুমাননি এবং দুই-তিন দিন পর্যন্ত শোকাহত ছিলেন। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কি কিছু বলেছিলেন? ওয়ালিদা সাহেবা বললেন, তিনি শুধু এতটুকুই বলেছিলেন: "আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু বিরোধীরা তার মৃত্যুকেও আপত্তির বিষয় বানাবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, মুহাম্মদী বেগম ছিলেন উমরা-উন-নিসা'র কন্যা, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চাচাতো বোন; অর্থাৎ তিনি মির্জা নিজামউদ্দিন, মির্জা ইমামউদ্দিন প্রমুখের প্রকৃত ভাগ্নি ছিলেন। আমাদের তায়ী (কাকিমা), মির্জা গোলাম কাদির সাহেবের বিধবা, ছিলেন মুহাম্মদী বেগমের খালা। সুতরাং হোশিয়ারপুরের মির্জা আহমদ বেগ, যিনি মুহাম্মদী বেগমের পিতা, তিনি মির্জা ইমামউদ্দিন প্রমুখের ভগ্নীপতি ছিলেন। এ ছাড়া আরও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল; যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আপন সহোদরা বোনের বিয়ে হয়েছিল মির্জা আহমদ বেগের বড় ভাই মির্জা গোলাম গওস সাহেবের সঙ্গে। এটি অনেক পুরনো ঘটনা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই সমস্ত আত্মীয় অত্যন্ত ধর্মবিমুখ ছিল এবং ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না; বরং তারা শরিয়ত নিয়ে উপহাস করত। তাদের এই অবস্থা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেন, যাতে তাদের জন্য কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়-হয় তাদের সংশোধনের জন্য, নয়তো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য। তখন আল্লাহ্ তাকে ইলহাম করেন যে, আহমদ বেগের কন্যা মুহাম্মদী বেগমের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ কর। যদি তারা তা মেনে নেয় এবং মেয়েটির বিয়ে তোমার সঙ্গে দেয়, তবে তারা বরকতের অংশীদার হবে; আর যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নাজিল হবে, তাদের ঘরবাড়ি বিধবায় পূর্ণ হয়ে যাবে, এবং বিশেষভাবে মেয়েটির পিতা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তিন বছরের মধ্যে, বরং খুব শীঘ্রই মারা যাবেন; আর যার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হবে, সেও আড়াই বছরের মধ্যে মারা যাবে।

এই শেষোক্ত দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন যেভাবে পূর্ণ হয়েছে, তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহে বহু স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ আহমদ বেগ তার কন্যার বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন; আর মির্জা সুলতান মুহাম্মদ, যার সঙ্গে তারা মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে দিয়েছিল, আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার বহু আত্মীয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে বিনয় ও প্রার্থনাপূর্ণ চিঠি পাঠায়, এমনকি তার নিজের চিঠিও-যাতে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেছেন-'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাদের ওপর থেকে সেই শাস্তি দূর হয়ে যায়।

অবশিষ্ট আত্মীয়দের সম্পর্কে একটি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যার প্রভাব এই হয়েছিল যে, তাদের ঘরগুলো, যা ভবিষ্যদ্বাণীর সময় পুরুষে পরিপূর্ণ ছিল, সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে যায়। এখন সেই সমগ্র পরিবারে একটি শিশুকে ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই, এবং সেই শিশুটিও আহমদী হয়ে গেছে। এছাড়া মির্জা ইমামউদ্দিনের কন্যাও বহুদিন ধরে আহমদী হয়ে আছেন। তারপর মুহাম্মদী বেগমের মা-মির্জা আহমদ বেগের বিধবা-এবং মির্জা আহমদ বেগের নাতি, এবং আমাদের তায়ী (মুহাম্মদী বেগমের খালা)-সবাই বায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তদুপরি, মুহাম্মদী বেগমের আপন বোনও আহমদী হয়েছিলেন, যদিও তিনি এখন মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের ছাড়া আরও অনেক আত্মীয় আহমদী হয়েছেন, এবং যারা এখনো জামাতের অন্তর্ভুক্ত হননি, তারাও অন্তত বিরোধিতা ত্যাগ করেছেন। এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইলহাম-"আমরা এই ঘরে কিছু হাসনী পদ্ধতিতে এবং কিছু হুসাইনী পদ্ধতিতে প্রবেশ করব"-স্বমহিমায় পূর্ণ হয়েছে।

{৩৮} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বর্ণনাকারী বলেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিয়া শরীফ আহমদের বাড়ির সংলগ্ন একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওয়ালিদা সাহেবা সম্ভবত কাছে ছিলেন। কথা বলতে বলতে আমি মির্জা নিজামউদ্দিনের নাম উল্লেখ করি, কিন্তু শুধু "নিজামউদ্দিন" বলি। তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) "মিয়া, আর যাইহোক, তিনি তোমার চাচা-এভাবে নাম নেওয়া উচিত নয়।"

বর্ণনাকারী যোগ করেন যে, মির্জা ইমামউদ্দিন, মির্জা নিজামউদ্দিন এবং মির্জা কামালউদ্দিন ছিলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চাচা মির্জা গোলাম মুহিউদ্দিনের পুত্র। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা ধর্মীয় কারণে তার প্রবল বিরোধিতা করতেন। তারা ঘোর সংসারী ও ধর্মবিমুখ ছিলেন, এমনকি ইসলামকে নিয়ে উপহাস করতেন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বর্ণনাকারী অবহেলায় নামটি বলেছিলেন, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান চরিত্র তা পছন্দ করেননি।

{৩৯}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি শুনেন মির্জা ইমামউদ্দিন তার ঘরে উচ্চস্বরে কাউকে বলছেন, "ভাই, এরা (হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইঙ্গিত করে) দোকান চালিয়ে মুনাফা কামাচ্ছে, আমরাও একটা দোকান চালাই।" তিনি বলেন, এরপর তিনি ধাঙড়দের মধ্যে পীরত্বের একটি ধারা চালু করেন। তিনি আরও বলেন, প্রধান ও সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন মির্জা ইমামউদ্দিন; তার মৃত্যুর পর মির্জা নিজামউদ্দিন প্রমুখদের পক্ষ থেকে তেমন বিরোধিতা আর ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, মির্জা ইমামউদ্দিনের কন্যা, যিনি মির্জা সুলতান আহমদের সঙ্গে বিবাহিত, কিছুদিন ধরে আহমদিয়া মত গ্রহণ করেছেন। (শেষাংশ শেষের পাতায়....)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

মক্কা, কা'বা এবং কুরাইশ নবীদের পিতা, খলীলুল্লাহ

হযরত ইবরাহিম–তাঁর নাম কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। এমন কে আছে যে নবীদের পিতা, আল্লাহর বন্ধু ইবরাহিম–কে চেনে না? মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি–সকলেই তাঁকে স্বীকার করে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব একুশ থেকে বাইশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁর যুগ নির্ধারিত; অর্থাৎ তিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর প্রায় সাতাশ–আটাশ শতাব্দী পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি নূহ (আ.)–এর বংশধর ছিলেন এবং ইরাক–এর অধিবাসী ছিলেন; তবে পরবর্তীতে মিশর প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ফিলিস্তিন–এ বসবাস শুরু করেন।

তিনি তিনটি বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল সারা, দ্বিতীয় হাজেরা এবং তৃতীয় কেতুরা। শেষোক্ত সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না এবং এখানে তার সরাসরি প্রাসঙ্গিকতাও নেই; তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি মিদিয়ান জাতির বংশধর ছিলেন। প্রথম দুই স্ত্রীর মধ্যে সারা ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত, আর হাজেরা ছিলেন ভিন্ন বংশের এবং মিশর–এর অধিবাসী। এই দুই স্ত্রীর গর্ভ থেকে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এবং তাদের বংশ এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে আজ পৃথিবীর সর্বত্র তাদের উপস্থিতি দেখা যায়।

হাজেরার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাঈল (আ.), যিনি ইবরাহিম (আ.)–এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর সারার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন ইসহাক (আ.)। এই উভয় সন্তানই বিশেষ ঐশী সুসংবাদ অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ বরকতের প্রতিশ্রুতি ছিল। তাদের নামও ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছিল। বিশেষত ইসমাঈল (আ.)–এর ক্ষেত্রে ইবরাহিম (আ.) ও হাজেরার বিশেষ দোয়া ছিল। তাঁর নাম 'ইসমাঈল'–যার অর্থ "আল্লাহ শুনেছেন–এই বিষয়টিই প্রকাশ করে। অতএব, আল্লাহ উভয় সন্তানকে মহান বরকতের উত্তরাধিকারী করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের বংশধরদের বিভিন্ন নিয়ামতে ভূষিত করেন।

এভাবে বনি ইসরাঈল–যাদের মধ্যে মূসা (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.) এবং ঈসা (আ.)–এর মতো মহান নবীগণ আবির্ভূত হয়েছেন–তারা ইসহাক (আ.)–এর বংশধর। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ইসমাঈল (আ.)–এর বংশধর, যারা আরবে বসতি স্থাপন করেন এবং যাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

হিজাজে বসতি স্থাপন ও মক্কার জনবসতি

ইসমাইল (আ.) তখনও শিশু ছিলেন, যখন তাঁর বিমাতা সারাহ কোনো একটি কারণে রাগান্বিত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে বললেন, "হাজেরা ও তার ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দাও।" স্বাভাবিকভাবেই, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এই কথায় গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে বললেন, "তুমি দুঃখিত হয়ো না এবং এ বিষয়টিকে মন্দ মনে করো না; বরং সারাহ যেমন বলছে, তেমনই করো। ইসহাক (আ.)–ও তোমার সন্তান, কিন্তু আমি হাজেরার পুত্র ইসমাইল থেকে একটি জাতি গড়ে তুলতে চাই।"

সুতরাং, এই ঐশী নির্দেশের আনুগত্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে আরবের হিজাজ অঞ্চলের বক্কা উপত্যকায় ইসমাইল ও তাঁর মাতা হাজেরাকে বসবাসের জন্য রেখে আসেন। এটাই সেই উপত্যকা, যেখানে বর্তমানে মক্কা নগরী অবস্থিত। তখন এটি ছিল সম্পূর্ণ নির্জন ও উষর এক মরুভূমি। এই উপত্যকার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের নিকটে অল্প কিছু খাদ্যসামগ্রীসহ তিনি এই দুই অসহায় প্রাণকে রেখে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে চলে যেতে দেখে হাজেরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন আমাদের এভাবে একা রেখে যাচ্ছেন?" হযরত ইব্রাহীম (আ.) নীরবে এগিয়ে যেতে থাকলেন এবং কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে হাজেরা বললেন, "অন্তত কিছু বলুন–আল্লাহ কি আপনাকে এমন করতে আদেশ করেছেন?" হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, "হ্যাঁ," এবং নীরবে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তখন হাজেরা বললেন, "যদি এটি আল্লাহ্‌র আদেশ হয়, তবে আপনি নিশ্চয়ই যান। আল্লাহ্ আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।" এ কথা বলে হাজেরা ফিরে এলেন।

পবিত্র কুরআনে এই ঘটনাটি হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর ভাষায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ ۔

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট এক অনাবাদি উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি এ কাজ করেছি যাতে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। অতএব তুমি মানুষের হৃদয়গুলোকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদের ফলমূল দ্বারা রিযিক দান কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

সাধারণ ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করেন–এবং হাদীসেও উল্লেখ আছে–যখন হাজেরার খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে গেল, তখন স্বাভাবিক মানবিক প্রয়োজনের কারণে তিনি তাঁর শিশুকে নিয়ে গভীর উদ্বেগে পড়ে গেলেন। তিনি এদিক–ওদিক পানি খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পাওয়া গেল না, এবং তৃষ্ণার কারণে শিশুটির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইসমাইলের এই করুণ অবস্থা তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, তাই তিনি সেখান থেকে সরে গেলেন, যাতে নিজের শিশুর তৃষ্ণায় মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে না হয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং পানির সন্ধানে দৌড়াতে থাকলেন।

চারপাশ ভালোভাবে দেখার জন্য তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে গেলেন। সেখান থেকে আবার দৌড়ে সাফার দিকে এলেন। এইভাবে গভীর উদ্বেগ ও অস্থিরতার মধ্যে তিনি এই দুই পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়ালেন। এ সময় তিনি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকলেন। কিন্তু না পানির কোনো সন্ধান মিলল, না কোনো মানুষের দেখা পাওয়া গেল।

অবশেষে, যখন হাজেরার দুঃখ চরমে পৌঁছাল, সপ্তমবারের পর তিনি একটি অদৃশ্য আওয়াজ শুনলেন, "হে হাজেরা! আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার সন্তানের আওয়াজ শুনেছেন।" এই আওয়াজ শুনে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, যেখানে তার শিশু তৃষ্ণায় ছটফট করছিল, সেখানে একটি ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছে। ফেরেশতাটি তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটি আঘাত করছিল, যেন কিছু বের করছে। হাজেরা কাছে গিয়ে দেখলেন, সেই স্থান থেকে একটি ঝরনা ফেটে বের হয়েছে এবং পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

হাজেরার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার শিশুকে পানি পান করালেন এবং পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চারপাশে পাথর দিয়ে ঘিরে একটি ছোট পুকুরের মতো বানিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, "আল্লাহ্ হাজেরার ওপর রহম করুন। যদি তিনি পানি আটকে না রাখতেন, তবে তা একটি প্রবাহমান ঝরনায় পরিণত হতো।" রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, হজের সময় সাফা ও মারওয়ার মধ্যে 'সাঈ' (দৌড়ানো) করা হাজেরার সেই পবিত্র স্মৃতিরই নিদর্শন।

এই ঘটনাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা পরিবর্তিত বর্ণনা বাইবেলেও পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ (সা.) হাজেরার এই পবিত্র স্মৃতিকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, আরেকটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি একবার তাঁর সাহাবাদের বলেছিলেন, "যখন আল্লাহ্ তোমাদের হাতে মিসরের দেশ বিজয় দান করবেন, তখন তার অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন করবে; কারণ আমাদের মাতা হাজেরা (যিনি মিসরীয় ছিলেন)–এর কারণে মিসরবাসীদের ওপর তোমাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে।"

যাই হোক, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন হাজেরা ও ইসমাইলকে মক্কার অনাবাদি ভূমিতে রেখে ফিরে গেলেন, তখন একটি অলৌকিক ঝরনার আবির্ভাব ঘটে। এই ঝরনাটি–যা ইসলামের ইতিহাসে 'জমজম কূপ' নামে পরিচিত–এর কারণে ধীরে ধীরে মক্কা উপত্যকায় মানুষ বসবাস শুরু করে এবং মক্কার বসতি গড়ে ওঠে। উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম এখানে বসতি স্থাপনকারী গোত্র ছিল জুরহুম, যা বনি কাহতানের একটি শাখা। এই গোত্র ইয়েমেন থেকে এসেছিল এবং প্রথমে বক্কা উপত্যকা থেকে কিছুটা দূরে বাস করত। কিন্তু যখন তারা জমজমের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তাদের প্রধান মুদাদ বিন আমর জুরহুমী হাজেরার কাছে সেই ঝরনার নিকটে বসবাসের অনুমতি চান। হাজেরা আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দেন, এবং এভাবেই জুরহুম গোত্রের লোকেরা বক্কা উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে।

ইসমাঈল জাবিহুল্লাহ

হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)–কে বাক্কাহ উপত্যকায় বসবাসের জন্য স্থাপন করার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) সময় সময় মক্কায় আগমন করতেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতেন। যখন হযরত ইসমাইল (আ.) কিছুটা বড় হলেন–কিছু বর্ণনা অনুসারে প্রায় তেরো বছরে উপনীত হন–তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি স্বপ্ন দর্শন করেন যে তিনি হযরত ইসমাইল (আ.)–কে কুরবানি করছেন। যেহেতু তখনও হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর প্রতি এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি যে নরবলিদান প্রত্যক্ষ অর্থে অবৈধ, এবং সে যুগে নরবলিদানের প্রচলনও ছিল, অতএব তিনি এই স্বপ্নকে বাহ্যত বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং হযরত ইসমাইল (আ.)–এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। হযরত ইসমাইল (আ.) উত্তরে বলেন যে, আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্ন পূর্ণ করুন; আমি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছি।

পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.)–কে বাইরে নিয়ে যান এবং তাঁকে ভূমিতে শায়িত করে কুরবানির জন্য প্রস্তুত হন। অনুগত পুত্র নীরবতা ও সন্তুষ্টির সঙ্গে নিজের গর্দান পিতার সম্মুখে অর্পণ করেন। প্রায় এমন সময় উপস্থিত হয়েছিল যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছুরি প্রয়োগ করবেন, ঠিক তখনই খোদার এক ফেরেশতা আহ্বান করে বলেন, "হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার পক্ষ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 16-23 Apr 2026 Issue No.16-17

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর...)

{৪০}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কাজী আমির হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার তার খাজা কামালউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বিবাদ হয়। খাজা সাহেব বলেন, "কাজী সাহেব, আপনি কি জানেন না প্রতিশ্রুত মসীহ আমাকে কত সম্মান করেন?"আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি জানি তিনি আপনাকে খুব সম্মান করেন, কিন্তু আমি আপনাকে একটি কথা বলি।"

তিনি বলেন, একবার তিনি অমৃতসর থেকে কাদিয়ানে এসে প্রতিশ্রুত মসীহের সঙ্গে দেখা করেন, আগে তাকে জানিয়ে। তখনও তারা শিষ্টাচার পুরোপুরি শেখেননি; যখন দেখা করতে চাইতেন, তাকে জানাতেন এবং তিনি ভিতর থেকে ডেকে নিতেন বা নিজে বের হয়ে আসতেন। পরে তারা বুঝতে পারেন যে, একজন রসূলকে এভাবে ডাকা উচিত নয়।

তিনি বলেন, দেখা করার সময় প্রতিশ্রুত মসীহ শেখ হামিদ আলীকে নির্দেশ দেন তার জন্য চা প্রস্তুত করতে। কিন্তু তিনি ভয় পান যে এই আপ্যায়ন হয়তো মুনাফিক বা দুর্বল ঈমানদারদের মতো করা হচ্ছে, তাই তিনি অনেক ইস্তিগফার পড়েন।

এই ঘটনা বলার পর তিনি খাজা সাহেবকে বলেন, "হয়তো আপনাকেও এই ধরনের সম্মান দেওয়া হচ্ছে।" এরপর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের একটি উদাহরণ দেন যে, তিনি দুর্বল ঈমানদার বা মুনাফিকদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করতেন। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একবার তিনি কিছু সম্পদ বণ্টন করেছিলেন, কিন্তু একজন ব্যক্তিকে বাদ দিয়েছিলেন, যাকে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস বেশি যোগ্য মনে করতেন। সা'দ বারবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং শেষে নবী বলেন, "সা'দ, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ। আল্লাহর কসম, কখনো কখনো আমি কাউকে কিছু দিই, যদিও অন্য কেউ আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়, কিন্তু আমি তাকে দিই যাতে সে মুখ থুবড়ে আগুনে না পড়ে-অর্থাৎ তার মন জয় করা ও পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য।

কাজী সাহেব উপসংহারে বলেন, যার ঈমান দৃঢ়, তার এই বাহ্যিক সম্মান ও আপ্যায়নের প্রয়োজন হয় না; তাদের সঙ্গে ভিন্নভাবে আচরণ করা হয়।

(সীরতুল মাহদি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫-৩০, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত) (চলবে)

(৯ পাতার পর....)

থেকে স্বপ্ন পূর্ণ করেছো। এখন ইসমাইলকে ছেড়ে দাও এবং তার পরিবর্তে একটি মেষ আল্লাহ্‌র পথে কুরবানি কর; কারণ বাহ্যিকভাবে এটাই তার প্রতীক। কিন্তু স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য অন্যভাবে পূর্ণ হবে।"

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) সেই নির্দেশ অনুসারে একটি মেষ কুরবানি করেন। এই ঘটনার স্মারক হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে হজের সময় (পশু) কুরবানি প্রথা প্রবর্তিত হয়।

এই স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে; তবে আমাদের দৃষ্টিতে এর যথার্থ ব্যাখ্যা হলো-'যবেহ' বা কুরবানি দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করা বোঝানো হয়েছে, যা পার্থিব অর্থে জীবনের সমাপ্তির সমতুল্য। আমরা লক্ষ্য করি যে, হযরত ইসমাইল (আ.)-কে মক্কায় বসবাস করানোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল কাবা শরীফের নির্মাণ, তার সেবা এবং তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করা।

পরবর্তীকালে সময়ের প্রবাহে যখন মূর্তিপূজা তাওহীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন এই মহান স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা রূপে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা তাওহীদের প্রচারের জন্য নিজেদের জীবন প্রকৃত অর্থে উৎসর্গ করেন। এটিই সেই 'যবেহে আজীম' বা মহান কুরবানি, যার প্রতি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে-অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (আ.)-এর প্রতীকী কুরবানির পরিবর্তে একটি মহান কুরবানি নির্ধারিত হয়েছিল।

হজের সময় পশু কুরবানি করার প্রথাও এই পবিত্র স্মৃতিকে জীবিত রাখার জন্যই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, যাতে তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পথে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। (চলবে)

(সীরত খাতামান্নবীঈন, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৮, কাদিয়ান সংস্করণ, ২০০৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

(১ম পাতার পর.....)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম),-কে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তদুপরি, সূরা আল-ফাতিহায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে মুসলমানদের একটি অংশ আহলে কিতাবের অনুসরণ করবে। এই দুইটি বিষয় একত্রে বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, যেমন বনী ইসরাঈলের জন্য দুইটি শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল, তেমনি মুসলমানদের জন্যও অনুরূপ দুইটি শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

অতএব, এখানে وَعْدُ الْاٰخِرَةِ ("অপর একটি প্রতিশ্রুতি) দ্বারা মুসলমানদের দ্বিতীয় শাস্তিকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন এই শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে-অর্থাৎ কোনো এক সময়ের জন্য পবিত্র ভূমি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে-তখন আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাদেরকে সেই দেশে ফিরিয়ে আনবেন। বাস্তব ইতিহাসও এই ধারা সমর্থন করে: যেমন বুখতনসর-এর সময়ে প্রথমবার পবিত্র ভূমি ইহুদিদের হাত থেকে চলে গিয়েছিল, তেমনি ক্রুসেডের সময় মুসলমানদের হাত থেকেও তা চলে যায়। পরবর্তীতে, যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রায় তেরোশ বছর পরে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর-যখন বাহ্যত মনে হয়েছিল যে তিনি সেই দেশের লোকদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন-বনী ইসরাঈল আবার পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়; অনুরূপভাবে, এই যুগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর প্রায় সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলমানদের শাসনও পবিত্র ভূমি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। কুরআন যেভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিল, মুসলমানদের এই দ্বিতীয় শাস্তিই প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যম হয়েছে।

অতঃপর, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আল-আম্বিয়া (২১:১০৭) আয়াত إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ -এর তাফসীরে বলেন: আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনি যাবূরে কিছু শর্ত বর্ণনা করার পর এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন যে পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী হবে তাঁর নেক বান্দাগণ। এতে উপাসনাশীল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বার্তা রয়েছে, এবং আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি। এর অর্থ হলো, বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল-যে কেবল আল্লাহর নেক বান্দারাই পবিত্র ভূমিতে বসবাস করবে-তা দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয় যখন বনী ইসরাঈল সেই ভূমিতে প্রাধান্য লাভ করবে। কারণ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে যদি কোনো বিরতি ঘটে, তবে পুনরায় আল্লাহর বান্দারাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে।

অতএব, বলা হয়েছে যে এতে উপাসনাশীল বান্দাদের জন্য একটি বার্তা রয়েছে-অর্থাৎ মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে এমন এক সময় আসবে যখন বনী ইসরাঈল আবার সেই ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। 'আবেদীন' (ইবাদতকারী) শব্দটি দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা বোঝায় যে আল্লাহর বান্দাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি তারা কোনো সময় প্রকৃত অর্থে আল্লাহর 'ইবাদ' (বান্দা) হওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তাআলা ইহুদিদেরকে সেই ভূমিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে মুসলমানদের উচিত আবার ইবাদতগুজার হয়ে ওঠা; এর ফলে তারা পুনরায় প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল যুগের জন্য রহমত, এবং তাঁর যুগ তখন শেষ হয়ে যায় না যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বরং এর পরেও এমন এক সময় রয়েছে যার জন্য তিনি রহমতস্বরূপ।

অতএব, নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যখন পুনরায় আল্লাহর রহমত পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে, তখন মুসলমানরা আবার ফিলিস্তিনে প্রাধান্য অর্জন করবে।

(তাফসীর কবীর, খণ্ড ৪, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০৫; খণ্ড ৫, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ১০৬) (তফসীরে কবীর, খণ্ড-৫, সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir